# একাত্তরে বাতেন বাহিনী

# একাত্তরে বাতেন বাহিনী

একাত্তরে বাতেন বাহিনী
বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজবাহ উদ্দিন নয়ন
প্রকাশকাল * মে ২০২৩
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৫৫২-৪৬০৯৯৪, ০১৫৫৮-৪০৫৪৫৮
গ্রন্থস্বত্ব * লেখক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস * ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ।
মুদ্রণ ও বাঁধাই * দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯১১০৯-৮-৯
ISBN: 978-984-91109-8-9
**Ekattore Baten Bahini by**
Bir Muktijuddha Mejbah Uddin Noyon
Published by Chayyanir.Shantikunja More, BSCIC Road,
Thanapara, Tangail, 1900.
Date of Publication: May 2023
Copy Right: Writer
Cover design & Book Setup: Chayyanir Computer
Price: TK. .............../- (..........................)

বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজবাহ উদ্দিন নয়ন

# উৎসর্গ

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে
ত্রিশ লাখ শহিদ
ও
সম্ভ্রম হারানো দু' লক্ষ মা- বোনের স্মরণে।

# মুখবন্ধ

২০২২ খ্রিস্টাব্দে এসে ৭২ বছরে পদার্পণ করেছি। আমি এখন পৌঢ়ত্বের দ্বার প্রান্তে। সেই পাকিস্তান আমলের গোড়ার দিকে ০৫-০৫-১৯৫০ এ একটি অজপাড়া গাঁয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম। শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভে নিজ জন্ম স্থানে অবস্থিত কোনড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী মতিলাল সরকারকে শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়েছিলাম। যিনি তাঁর বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার পরও আমার পুরো শিক্ষাজীবন ডাকযোগে পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখে আমার খোঁজ খবর নিতেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমি যখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র, একদিন প্রধান শিক্ষক পঞ্চম শ্রেণির অঙ্কের ক্লাস নিচ্ছিলেন, একটি অঙ্ক ঐ শ্রেণির কোনো ছাত্র-ছাত্রী না পারার প্রেক্ষিতে আমাকে ঐ ক্লাসে ডেকে নিয়ে অঙ্কটি করতে আদেশ দিয়েছিলেন। আমি অঙ্কটি সঠিকভাবে করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তখন শ্রী মতিলাল সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আমাকে বলেছিলেন, "নয়ন তুমি এক চান্সে বি এ পাশ করবে"। তাঁর এহেন গুরুত্বপূর্ণ দূরদর্শী সুদূর প্রসারী মন্তব্যটি হুবহু আমার শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ টাঙ্গাইলের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাসিন তারক যোগেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। এলাসিন সানবাড়ী গ্রামে মামার বাড়িতে থাকতাম। ভর্তির প্রাথমিক পর্যায় থেকে নিয়মিত লেখাপড়া ও শ্রেণি কক্ষে উপস্থিতির কারণে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু মদন মোহন গোস্বামীসহ অন্যান্য সহকারী শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করি। সেই সাথে সহপাঠীদের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে একটি বিশেষ হৃদ্যতাপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। যার ফলে পঞ্চম শ্রেণি হতে একনাগাড়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল ক্লাসে আমার প্রিয় সহপাঠী বন্ধুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বসম্মত উপায়ে আমাকে ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করতো। আর নাইনের ক্লাস ক্যাপ্টেন মানেই হলো স্কুলের ক্যাপ্টেন । ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তারকযোগেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি. পাশ করি।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আমার প্রিয় ছাত্রনেতা খন্দকার আবদুল বাতেনের হাত ধরে সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইলে ভর্তি হওয়ার পর, আমার আর একজন প্রিয় ছাত্রনেতা সা'দত কলেজ, করটিয়া ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি শাজাহান সিরাজকে পুনরায় ভিপি প্রার্থী হিসেবে পাই। খন্দকার আবদুল বাতেনের নেতৃত্বে তাঁর একজন নতুন ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে শাজাহান সিরাজের পক্ষে ভোটের মাঠ চষে বেড়াই। জনাব শাজাহান সিরাজ সা'দত কলেজ, করটিয়া ছাত্র সংসদের পুনরায় ভিপি নির্বাচিত হন। আর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে জনাব শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে খন্দকার আবদুল বাতেন সা'দত কলেজ, করটিয়া ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। সেই যুগে একটি সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসে যেটুকু লেখাপড়া করতে পেরেছি, এর পেছনে আমার বাবা তাঁর সাধ্যানুসারে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া আমার মামারা (যে বাড়িতে ৩০ বছর কাটিয়েছি) বিশেষ করে আমার বড় মামা মো. তোরাপ আলী মিয়া এবং খন্দকার আবদুল বাতেন আমার লেখাপড়ার ব্যাপারে অভিভাবকত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। তাই আমি আল্লাহর কৃপায়, মুরুব্বীদের আশীর্বাদে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এলাসিন তারক যোগেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল থেকে এইচ.এস.সি এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল থেকে বি.এ পাশ করি।

যখন জাতি, রাষ্ট্র, রাজনীতি সম্পর্কে কিছু কিছু বুঝতে শিখলাম, তখন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচন, ছাপ্পান্নতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি, আটান্নতে আয়ূবের সামরিক শাসন, বাষট্টিতে কুখ্যাত হামুদুর রহমান শিক্ষানীতি বিরোধী ছাত্রবিক্ষোভ ইত্যাদি বিষয়ে পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে অবগত হতে থাকি। আর ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, আটষট্টিতে শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামী করে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এই নামে ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের, উনসত্তরের গণআন্দোলনের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবের মুক্তি ও বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত, আয়ূব খানের বিদায়, ইয়াহিয়া খানের আগমন। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর সুদক্ষ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ও স্বাধিকার আন্দোলন। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়া খানের বিদায়, বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা হিসেবে অধিষ্ঠিত। ১৯৬৬খ্রি. থেকে উপরোক্ত তাবৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা আন্দোলন, সংগ্রাম, রাজপথের একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে এবং রণাঙ্গনে বাতেন বাহিনীর একজন লড়াকু সংগঠক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি।

এত সব অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে আন্তরিকভাবে অনুধাবন করলাম, বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে, 'একাত্তরে বাতেন বাহিনী' নামে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে একটি বই লিখতে প্রয়াসী হই। এই বইটিতে অন্যান্য আন্দোলন, সংগ্রাম, নির্বাচন এর পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রণাঙ্গনে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কাহিনি কিছুটা হলেও তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

একটি বিশেষ বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে চাই। তা হলো, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক একাত্তরে বাতেন বাহিনীর সাবেক অধিনায়ক, সা'দত কলেজ, করটিয়া ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি, টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, নাগরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, দুই

মেয়াদের সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ১৩৫, টাঙ্গাইল-৬, নাগরপুর-দেলদুয়ার, জনাব আলহাজ খন্দকার আবদুল বাতেন। তিনি আপাদমস্তক বাঙালি, অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, কথোপকথনে শুদ্ধ উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিলেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস, অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বর্তমান শেখ হাসিনার সরকার খন্দকার আবদুল বাতেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক বাতেন বাহিনীকে প্রাতঃস্মরণীয় করে রাখার নিমিত্তে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স এর পাশেই, 'বীরমুক্তিযোদ্ধা বাতেন বাহিনী-মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি যাদুঘর', দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল (প্রতিষ্ঠা ২০২০খ্রি.) এই নামে একটি আধুনিক ভবন (পাকা ভবন) নির্মাণ করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে '৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন বাতেন বাহিনীর অন্যতম সংগঠক এবং বাতেন বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য কর্মকর্তা, "একাত্তরে বাতেন বাহিনী" বইয়ের লেখক হিসেবে, সর্বোপরি বাতেন বাহিনীর পক্ষ থেকে আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজবাহ উদ্দিন নয়ন সদাশয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর দেলদুয়ার উপজেলা প্রশাসনকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

আমি ইতিহাসবেত্তা নই, মূলত লেখকও নই। সাধারণ পরিবারের সন্তান আমি। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাশ করেছি, '৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বরাবর সম্পৃক্ত ছিলাম, আছি, থাকবো। আমার সাধ্য অত্যন্ত সীমিত। বই প্রকাশনার ব্যাপারে 'ছায়ানীড়ের' সক্রিয় ভূমিকা ভুলবার নয়।

এমতাবস্থায়, হাজারও সতর্কতা সত্ত্বেও জীবনের প্রথম লেখা বইটির ভেতর কোথাও কোনো ভুল-ক্রুটি থাকবে না, এমন কোনো কথা নয়। বরং থাকাটাই স্বাভাবিক। তেমন কিছু নজরে পড়লে সুহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ আমার সেই অক্ষমতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি।

**বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজবাহ উদ্দিন নয়ন**

# সূচি

ক্রমিক নং--------------------------------------------------------------------পৃষ্ঠা

০১. **মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি**------------------------------- **১১**

০২. একাত্তরে বাতেন বাহিনী------------------------------------- ২৬

০৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র--------------------------------- ৭০

০৪. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের জবানবন্দি-------------৮৮

## মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সময়ের পরিধি '৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ৮ মাস ২০ দিন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনোত্তর উত্তপ্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বিবেচিত হলেও এর একটা ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। উক্ত পটভূমির ব্যাপারে সন-তারিখ বা বিষয়বস্তু নিয়ে ভিন্নমত লক্ষণীয়। কারো কারো মতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক পলাশীর প্রান্তরে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সৈন্যদের সাথে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদের এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে নবাবের সেনাপ্রধান মীর জাফরের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের হাতে ক্ষমতা হস্তগত হয়। প্রায় দু'শ বছর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকরা এদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে। এই দীর্ঘকাল পরিক্রমায়, বিভিন্ন পর্যায়ে, কখনও নিয়মতান্ত্রিক, কখনও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। যার ফলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলা পূর্বপাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে এ অঞ্চলের স্বাধীনতার একটি পর্যায় অর্জিত হয় এবং এরই সূত্র ধরে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সার্বিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

কেউ কেউ মনে করেন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক সুবিধার্থে বৃহত্তর বাংলাকে দু'ভাগ করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে দু'টি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হয় ঢাকায়। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ উক্ত নতুন প্রদেশকে স্বাগত জানায়। কারণ তাদের সাথে নানাবিধ সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মোচিত হয়। কিন্তু কোলকাতা কেন্দ্রিক তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলন ও পরবর্তীকালে সন্ত্রাসী আন্দোলনের চাপে নতুন প্রদেশ রদ করা হয়। নতুন প্রদেশের সম্ভাবনাময় চিত্র এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ কখনো ভুলতে পারেনি। অপরদিকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ গঠনের দাবি করা হয়। এতে পূর্বাঞ্চলের বাংলা, আসাম ও তৎসন্নিহিত এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। পরবতীকালে পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবির যুক্তি হিসেবে লাহোর প্রস্তাবের কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। তাই অনেকের মতে, লাহোর প্রস্তাবকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাগুলো যেমন পলাশীর যুদ্ধ, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ এবং লাহোর প্রস্তাবের কোনোটাতেই ভৌগোলিক সীমারেখা সুনির্দিষ্ট ছিল না। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার,



উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয়েছিল বাংলা প্রদেশ; ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পূর্বাংশ এবং আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশের সৃষ্টি হয়েছিল। অনুরূপভাবে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখা অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

উল্লেখ থাকে যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাগের পূর্ব মুহূর্তে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কয়েকজন হিন্দু-মুসলিম নেতা স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সে চেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি। কারণ দেশ তখন সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন। বাংলা বিভাগ যখন অনিবার্য হয়ে উঠে তখনও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছিলেন পূর্ব বাংলার জনসাধারণ যদি আন্তরিকভাবে চায় এবং দেশের সমৃদ্ধির জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে তাহলে প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদ নিয়েই পূর্ব বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদার সাথে টিকে থাকতে পারে। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের বাংলা ভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির সময় থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কে ঐতিহাসিক পটভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এ সময়ই বর্তমান বাংলাদেশের একটি ভূখণ্ড চিহ্নিত।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত করে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর স্বাভাবিকভাবেই নতুন দেশের শাসনভার মুসলিম লীগের উপর ন্যস্ত হয়। শতাব্দীর রক্তক্ষয়ের পর উপনিবেশের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সঙ্গত কারণেই পাকিস্তানের, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রত্যাশা ছিল বুক ভরা। অনগ্রসর জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ দুই অঞ্চলের মাঝে গড়ে তুলবেন ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতি ও ভ্রাতৃত্বের সেতু বন্ধন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মুখোশ উন্মোচিত হতে শুরু করলো। পূর্ব বাংলার জনগণ এক শোষণ থেকে আর এক শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হবার আশঙ্কায় হতাশ হয়ে পড়তে লাগলো। তারা চোখের সামনে দেখতে পেল যে, পশ্চিমারা তাঁদের মুখের ভাষা পর্যন্ত কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করছে। ঢাকার যুবসমাজ তাই আগে থেকেই সচেতন হয়ে উঠলো। শুরু হলো মোহ ভঙ্গের পালা। দেশ ভাগের পর বেশ কিছুদিন শেখ মুজিবুর রহমান ভারতেই ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে যুব নেতৃত্ব দান করলেও মুসলিম লীগের বুর্জোয়া চরিত্রকে পছন্দ করতেন না। তাই ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দানের কথা ঘোষণা করার পরই তিনি কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজের সিরাজউদ্দৌলা হলে ছাত্র ও যুব

নেতাদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন এবং পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুসলিম লীগ বিরোধী ছাত্র, যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উক্ত সভায় শেখ মুজিব বলেছিলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে যেতে হবে, কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে এ স্বাধীনতা সত্যিকারের স্বাধীনতা নয়। হয়তো বাংলার মাটিতে নতুন করে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে, মুসলিম লীগের বুর্জোয়া মনোবৃত্তি ও পশ্চিমা প্রাধান্য থেকে এই আশঙ্কা হচ্ছে।" শেখ মুজিবুর রহমানের ধারণা অমূলক ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও পূর্ব বাংলার মানুষ ভিন্ন রকম আরেক ঔপনিবেশিক শাসকের হাতে পড়লো। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী শুধু এদেশের সম্পদই কেড়ে নিতে চাইত, কিন্তু নব্য ঔপনিবেশিকরা বাঙালির মুখের ভাষা বাংলাকে (যা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন লোকের ভাষা) কেড়ে নিতে চেয়েছিল এর ফলে বাঙালি জাতির মধ্যে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব বারোশত মাইল। মাঝে অন্য রাষ্ট্র ভারতের অবস্থান। দুই অংশের বেশির ভাগ জনসাধারণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও ভূমি ও মানুষের মধ্যে বৈষম্য ছিল প্রচুর। পূর্ব বাংলার আয়তন ৫৬ হাজার বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ছয় কোটি আর পশ্চিমাঞ্চলের আয়তন ছিল তিন লক্ষ দশ হাজার বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি। পূর্ব পাকিস্তানের বসতি ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৯২৫ জন এবং পশ্চিমাঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১২৮ জন। পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি সমতল, উর্বর এবং প্রায় সবটাই বাসযোগ্য আর পশ্চিমাঞ্চলের বেশির ভাগ এলাকা উর্বর, তৃণভূমি, মরু অঞ্চল ও অনুর্বর পাহাড়ি এলাকা অথবা লবণাক্ত সমতল ভূমি। ফলে অধিকাংশ অঞ্চল বসবাসের অযোগ্য। পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজ ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক আর পূর্ব বাংলার সমাজ ব্যবস্থা উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সচেতন। পূর্ব বাংলার ভাষা বাংলা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা পাঞ্জাবি, পশতু, উর্দু, সিন্ধি। সমস্ত পাকিস্তানের ৫৬% লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। উর্দু মাত্র ৬% লোকের ভাষা ছিল। তাছাড়া ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের চৌধুরী রহমত আলীর পাকিস্তান পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উপরোক্ত প্রাকৃতিক ও বাস্তব বৈষম্য ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও বিস্তর বৈষম্য লক্ষণীয়। বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের কোনো মর্যাদাবোধ ছিল না। তারা বাঙালিদের নিচু শ্রেণির মানুষ মনে করতো এবং বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা মনে করতো। উক্ত কারণে সব সময়ই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে নানা



ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার প্রারম্ভেই তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে মনোনিবেশ করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি ব্যবসায়ী, প্রশাসক এবং সেনা সদস্যদের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সচিবালয় থেকে শুরু করে তৎকালীন মহকুমা শহর পর্যন্ত সর্বোচ্চ পদগুলো অবাঙালিরা দখল করে ফেলে। আসলে এরা কেউই বাংলা ভাষা শিখেনি কিংবা বাংলা ভাষার প্রতি কোনো প্রকার আগ্রহ দেখায়নি, উপরন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়ার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিল। উর্দুই সারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দেয়া ছাড়াও আরবি হরফে বাংলা শেখার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এহেন কুটিল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে এবং বাংলা ভাষা দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি রক্ত দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের উন্মেষ ঘটেছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ঐতিহাসিক একুশ দফার। সেই একুশের প্রতীক একুশ দফাকে কেন্দ্র করে গঠিত যুক্তফ্রন্ট চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল। একুশের চেতনা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, যার পরিণতি স্বাধিকার এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম তথা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব।

মানব সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ বাঙালিদেরকে অধিকতর সচেতন করে তোলে। রাজনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি সমস্ত আর্থিক ক্ষমতাও পশ্চিম পাকিস্তানে কুক্ষিগত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্বপাকিস্তানের বাৎসরিক রপ্তানি আয় ছিল অনেক বেশি। তবু বাৎসরিক রপ্তানি আয়ের ৭০% এরও বেশি পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সিংহভাগ টাকাই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় হতো। সামরিক, বেসামরিক, সরকারি, বেসরকারি ক্ষেত্রগুলোতে চাকরিতে বাঙালিদের অবহেলা করা হতো। সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবিদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক অর্জিত অর্থে যে সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হতো সেই সেনাবাহিনীকে আইন শৃঙ্খলার নামে পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে ব্যবহার করা হতো।

বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলাকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানই যথেষ্ট এ অলীক স্বপ্ন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক ভারত যুদ্ধের পর দূরীভূত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের গভীর ক্ষোভের কারণ ছিল গণতন্ত্রেও প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর চরম অবহেলা। এটা ছিল তাদের ইচ্ছাকৃত সুচিন্তিত নীতি। কারণ তারা জানতো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা পরিচালিত বাঙালি জাতি রাষ্ট্রক্ষমতা

দখল করবে। এই কারণে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবিও অস্বীকার করা হতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম নয় বছরেও দেশের কোনো শাসনতন্ত্রে তৈরি হয়নি। নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দীর্ঘ নয় বছর পর যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিকূলে আর পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বাঙালিদের জন্য 'বিপদজনক সমঝোতায়' পরিপূর্ণ। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শুধু রাজনৈতিকভাবে সংখ্যা সাম্যনীতি ব্যবহার করা হতো।

দীর্ঘ ২৩ বছরে সমগ্র পাকিস্তানে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই যখন ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন দেয়া হলো কিন্তু বিজয়ী রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসতে দেয়া হলো না বিধায় পাকিস্তান দু'ভাগ হয়ে গেল।

সাম্রাজ্যবাদী সামরিক স্বৈর শাসন ও একনায়কত্ব সুলভ মনোভাব পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ব্যবধান আরো ব্যাপক ও ভয়ংকর করে তোলে এবং এরই ফলে জেনারেল আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনামলে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি আরো জোরদার হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধের পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক ছয় দফা ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৬ দফা দাবি জনসমক্ষে পেশ করার কারণে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী করা হয়। জেনারেল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের অবসান এবং গণতন্ত্র ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সারা পূর্ব বাংলায় ছাত্রজনতার দুর্বার গণআন্দোলনের ফলে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। জনরোষের ফলে উপয়ান্তর না দেখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

উনসত্তরের ২৩ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু)-এর তৎকালীন সহ-সভাপতি (ভিপি) তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান পুনরায় সামরিক শাসন জারীর মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। বঙ্গবন্ধুর দাবির মুখে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানব্যাপী সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ঘোষণা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দক্ষ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসতে দেয়া হয়নি। অবশেষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালিদের উপর অতর্কিতে ও অত্যন্ত বর্বরভাবে সশস্ত্র



আক্রমণ চালানো হয় এবং নৃশংসভাবে বাঙালিদের হত্যা করা হয়। এতে সামরিক, বেসামরিক, আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যসহ সর্বস্তরের বাঙালি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের ফলস্বরূপ ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর ৯৬ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সার্বিক বিজয় অর্জিত হয়।

**বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের  স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের লেখক রবার্ট পেইন তাঁর চাঞ্চল্যকর 'ম্যাসাকার' (নির্দয় হত্যাকাণ্ড) পুস্তকে লিখেছেন, "... মাঝরাত নাগাদ তিনি (বঙ্গবন্ধু) বুঝতে পারলেন যে, ঘটনা প্রবাহের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁর টেলিফোনটা অবিরাম বেজে চলেছে, কামানের গোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর দূর থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে। তখনও তিনি (বঙ্গবন্ধু) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, কিন্তু জানতেন যে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর ব্যারাকগুলো এবং রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার আক্রান্ত হয়েছে। এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটিগুলো নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর। তাই সে রাতেই ২৬ মার্চ তিনি (বঙ্গবন্ধু) দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন।"

সর্বত্র বেতার যোগে পাঠাবার জন্য তিনি (বঙ্গবন্ধু) টেলিফোনে নিম্নোক্ত বাণীটি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিকটেশন দিলেন: চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত এম এ হান্নানের এই বাণীটি যথাসময়ে পৌঁছে ছিল।

"The Pakistan army was attacked Police lines at Rajarbag and East Pakistan Rifels Head Quarters at Pilkhana at midnight. Gather strength to resist and prepare for a war of Independence. MASSACRE by Robert Payne (Page24): The Macmillan Company new york. (পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মাঝরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। প্রতিরোধ করবার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন) 'ম্যাসাকার' : রবার্ট পেইপ (পৃ. ২৪): দি ম্যাকমিলন কোম্পানি, নিউইয়র্ক।

**বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যখন গ্রেফতার করা হয়, ঢাকা শহর তখন জ্বলছে। তখন স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়ারলেস-এর মাধ্যমে ইথারে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বে রেকর্ডকৃত এই বাণীতে বলা হয়, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

**স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :** এটাই আমার শেষ বাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে যে যেখানে আছো দখলদার পাক-বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর সমস্ত সৈন্য অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চলবে। জয় বাংলা।

স্বাধীনতা ঘোষণার এই বাণী ২৬ শে মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাতে বিভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনার (ডিসি), পুলিশ সুপার (এস.পি) এবং পুলিশ স্টেশন কর্তৃক গৃহীত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ঘোষণার আলোকে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

**বাতেন বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট :** ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে সরকারের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। সরকার স্থাপিত হয়েছিল ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুরের আম্রকাননে। সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন), উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)। সারা বাংলাদেশকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে, পুরো যুদ্ধক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে, প্রতিটি সেক্টরে একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তবে যুদ্ধের মৌলিক নীতি নির্ধারণ ও সার্বিক দায়িত্ব ছিল মুজিবনগর সরকারের। মুজিবনগর সরকারের প্রধান কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির আজন্ম লালিত স্বপ্ন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া পররাষ্ট্র, অর্থ, তথ্য, সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়সহ অনেক দায়িত্বই এই মুজিবনগর সরকারকে পালন করতে হতো। মুজিব বাহিনীর দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারাও বিভিন্ন রণাঙ্গনে সেক্টর ভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন।

এছাড়া মুজিবনগর সরকার নিয়ন্ত্রিত সেক্টর ভিত্তিক নিয়মিত মুক্তিবাহিনী এবং মুজিব বাহিনীর বাইরেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় স্ব স্ব উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে পাকহানাদার বাহিনী নিধনের প্রত্যয়ে বিভিন্ন মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এ সব বাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল টাঙ্গাইলে বাতেন বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, অন্যান্য জেলায় হেমায়েত বাহিনী, রফিক বাহিনী, আফসার বাহিনী ইত্যাদি। বাংলাদেশের ভেতরে মুজিবনগর সরকার কিংবা ভারত সরকারের কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা ব্যতিরেকেই এই সমস্ত মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে এবং পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অগণিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য যে, এ সমস্ত বাহিনীর মধ্যে বাতেন বাহিনীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সাধারণ সৈনিক,



কর্মকর্তাবৃন্দ, ই.পি.আর-এর সৈনিক এবং অবসর প্রাপ্ত বেশ কিছু সেনাবাহিনীর সৈনিক যোগদান করেছিলেন। এদের সাহসী ভূমিকার কারণেই বাতেন বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ" নামে একটি গোপন সংগঠন করে তোলা হয়। কাজী আরেফ আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান– এই তিন সদস্য সমন্বয়ে "কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস" গঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কাজী আরেফ আহমেদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রলীগের কেন্দ্রে একটি ছায়া ফোরাম গঠন করা হয়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই ছায়া ফোরামের সদস্য ছিলেন আ. স. ম. আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ, মনিরুল ইসলাম ও স্বপন চৌধুরী। পরে বিভিন্ন সময়ে এই ফোরামে মাসুদ আহমেদ রুমী, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নূরুল আম্বীয়া এবং ৭০ খ্রিস্টাব্দে মোস্তাফিজুর রহমান এবং আ. ফ. ম মাহবুবুল হককে গ্রহণ করা হয়। ঢাকা শহর পরিচালনার জন্য আর একটি গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন মফিজুর রহমান খান। আর প্রতিটি জেলায় জেলা ফোরাম গঠন করা হয়। একজন নেতার দায়িত্বে ঐ ফোরাম পরিচালিত হতো। যেমন– দিনাজপুরে মাহতাব, বগুড়ায় মোস্তাফিজুর রহমান পটল, রংপুরে হারেশ, পাবনায় আহমেদ রফিক, যশোরে আলী হোসেন মনি, টাঙ্গাইলে খন্দকার আবদুল বাতেন, মানিকগঞ্জের রফিকুল ইসলাম বিল্টু, নরসিংদী-নারায়ণগঞ্জে মফিজুর রহমান, সিলেটে আকতার আহমেদ, কুমিল্লায় হাবীবুল্লাহ চৌধুরী, নোয়াখালিতে মাহমুদুর রহমান বেলায়েত, চট্টগ্রামে আবুল কালাম আজাদ, কুষ্টিয়ায় আব্দুল মোমেন এবং মাদারীপুরে আমীর হোসেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ-এর নেতৃত্বে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ" গঠনের পথ ধরে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে কাজী আরেফ আহমেদের তত্ত্বাবধানে একটি ছায়া ফোরাম গঠিত হয়– যার সদস্য ছিলেন আ. স. ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, মনিরুল ইসলাম ও স্বপন চৌধুরী। এই ছায়া ফোরামের নির্দেশক্রমে খন্দকার আবদুল বাতেনকে টাঙ্গাইল জেলার নেতৃত্বে আসীন করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে টাঙ্গাইল জেলা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে জেলার কার্যক্রম শুরুর প্রারম্ভেই আমি টাঙ্গাইল জেলায় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্যপদ লাভ করি। সদস্যপদ লাভের প্রাক্কালে খন্দকার আবদুল বাতেন আমাকে তাঁর বাড়িতে দীর্ঘ সময় গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক দিক, বিশেষ করে রণনীতি, রণকৌশল, বিপদ, আত্মরক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং অসংখ্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সেই সাথে একটি ছাপানো বড় কাগজ আমার হাতে দিয়ে পড়তে বলে। আমি বেশ কিছু সময় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা ঐ কাগজটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে যতটা

সম্ভব বুঝার চেষ্টা করলাম। এরপর তিনি বললেন, "এই কাগজটি যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী পড়েই ছিড়ে ফেলা কিংবা পুড়িয়ে ফেলা উচিত। কাছে রাখা খুবই বিপদজনক। তবে সাবধানে রাখলে তুই রাখতে পারিস।" আমি উক্ত কাগজটি অতীব সাবধানতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এই ভাবে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। খন্দকার আবদুল বাতেন বাঙালি জাতির মুক্তির মহান ব্রত নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে নিজ জেলা টাঙ্গাইলে একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তিবাহিনী গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ে মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন।

এরপর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে খন্দকার আবদুল বাতেন সা'দত কলেজ, করটিয়া ছাত্র সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত হন। উক্ত কলেজের ভিপি হওয়ার সুবাদে উনসত্তরে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনের প্রাক্কালে টাঙ্গাইল জেলা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগ টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন খন্দকার আবদুল বাতেন। এছাড়া ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের শেষ সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগ মনোনীত জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীদের অন্যতম ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের পক্ষে তাঁর নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনায়, বিশেষ করে জনসভা, পথসভা, কর্মী সভায় বক্তৃতা দেয়ার ব্যাপারে খন্দকার আবদুল বাতেনকে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হতো। আর আজ (২০১৩খ্রি.) খন্দকার আবদুল বাতেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, জাতীয় সংসদ সদস্য ১৩৫, টাঙ্গাইল-৬ (নাগরপুর-দেলদুয়ার)।

১ মার্চ '৭১ দুপুরে এক বেতার ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ '৭১ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় নতুন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবি ঘোষণা করেন। এহেন অপকর্মটিও করা হয়েছিল ভুট্টোর জেদের কারণে। তিনি শুরু থেকেই বলে আসছিলেন, তিনি বিরোধী দলীয় আসনে বসবেন না এবং সংবিধান বিষয়ে মৌলিক বিষয়গুলো (ছয় দফা কেন্দ্রীক) সংসদের বাইরে নিষ্পত্তি হতে হবে। তিনি এও হুমকি দিয়েছিলেন ৩ তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অংশ নিতে ঢাকায় গেলে তাঁদের পা ভেঙে দেয়া হবে। আবারও জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পর্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিলেন ভুট্টোর স্বার্থ রক্ষার জন্য। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল চরম আত্মঘাতি এবং অখণ্ড পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেক।



১ মার্চ '৭১ সকাল থেকে হোটেল পূর্বানীতে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের যৌথ সভা চলছিল। একই দিন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, "যদি তাঁর পিপলস পার্টিকে বাদ দিয়ে ৩ মার্চের অধিবেশন বসে, তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জীবনযাত্রা নীরব নিথর করে দেয়া হবে।" এর পর পরই দুপুর ১টায় ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বলেন, "পাকিস্তানে এখন ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করছি।" এই ঘোষণার পর উত্তাল ঢাকা যেন আগ্নেয়গিরির মত জ্বলে উঠলো। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহ থেকে ছাত্ররা বের হয়ে আসে, ঘর থেকে জনতা ছুটে আসে রাজপথে, পল্টন ময়দান যেন জনসমুদ্র। হোটেল পূর্বানীর চারদিকে জনস্রোত, ঢাকা শহরে শ্লোগান আর শ্লোগান। সংগ্রামী বাংলা সেদিন ছিল অগ্নিগর্ভ, দুর্বিনীত। কারো চাপিয়ে দেয়া অন্যায় প্রভূত্ব মেনে নেয়ার জন্য, কারো কলোনি বা করদরাজ্য হিসেবে থাকার জন্য বাংলার মানুষের জন্ম হয়নি। বাংলার অপরাজেয় গণশক্তি সেদিন সার্বিক জাতীয় মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ইস্পাত কঠিন শপথের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর দুর্গম প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার প্রত্যয়ে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিল এই শ্লোগানে। (১) জাগো জাগো-বাঙালি জাগো (২) পদ্মা- মেঘনা-যমুনা- তোমার আমার ঠিকানা (৩) তোমার নেতা আমার নেতা– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (৪) বীর বাঙালি অস্ত্র ধর - বাংলাদেশ স্বাধীন কর (৫) তোমার দেশ আমার দেশ – বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

হোটেল পূর্বানীতে দেশ-বিদেশের অগণিত সাংবাদিক বঙ্গন্ধুর মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা নিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, "বিনা চ্যালেঞ্জে আমি কোনো কিছুই ছাড়বো না। ছয় দফার প্রশ্নে আপোষ করবো না। ৩ মার্চ থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল চলবে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।" ওই দিনই বঙ্গবন্ধু ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ডেকে "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠনের নির্দেশ দেন। নেতার নির্দেশে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ নূরে আলম ছিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ.স.ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুছ মাখন বিকেলেই এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ছাত্রলীগ ও ডাকসুর সমন্বয়ে "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করেন। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর তাৎক্ষণিক উক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে সারাদেশের প্রতিটি জেলা, থানা, ইউনিয়ন, প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভিত্তিতে তাঁদের আদলে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। সেই সাথে কেন্দ্রীয় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষিত সকল কর্মসূচী দেশের প্রতিটি শাখাকে যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানানো হয়।

উপযুক্ত নির্দেশনার আলোকে তৎকালীন টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে খন্দকার আবদুল বাতেন ও আলমগীর খান মেনু এবং সেই সময়ের সা'দত কলেজ, করটিয়া ছাত্র সংসদের ভি.পি, জি.এস সমন্বয়ে টাঙ্গাইল জেলা স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। আমিও আমার নেতৃত্বে এলাসিন (দ. টা.) আঞ্চলিক স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। ঘোষিত সকল কর্মসূচী জেলা শাখাসহ অন্যান্য শাখা যথাযথভাবে পালন করছিল। দেশে এমনতর সংকটময় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে খন্দকার আবদুল বাতেন ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের নিয়ে, বিশেষ করে আমরা যারা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্য ছিলাম তাদের নিয়ে গোপনে বসে দেশের সংকটময় পরিস্থিতি, আমাদের করণীয়, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তি বাহিনী গঠনসহ বিভিন্ন বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন।

এ দিকে ১ মার্চেই '৭১ বিকেলের দিকে ঢাকা শহরের নানা জায়গায় ক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে পুলিশ, ই.পি.আর-এর সংঘর্ষ হয়। ই.পি.আর বিভিন্ন স্থানে জনতার উপর গুলি চালায়। সরকার কারফিউ জারী করে কিন্তু ক্ষুব্ধ জনতা কারফিউ ভঙ্গ করে নানাস্থানে অগ্নি সংযোগ করে। আওয়ামী লীগের পাকিস্তানিদের ছাড় দেয়ার কথা বিবেচনা করার সব পথ জনগণই এভাবে বন্ধ করে দেয়। এই ধারা পরের দিনও থাকে। ২ মার্চ '৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ডাকা গণজমায়েতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এর সহ-সভাপতি (ভি.পি) আ.স.ম আবদুর রব। পর দিন ৩ মার্চ '৭১ পল্টন ময়দানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম ছিদ্দিকীর সভাপতিত্বে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহুত বিশাল ছাত্রজনতা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার পাঠ করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। পরবর্তীকালে ক'টা দিন ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন স্থানে গুলি চলে এবং বাঙালি অবাঙালি সংঘর্ষও হয়।

এরই মধ্যে ৬ মার্চ '৭১ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় ২৫ মার্চ '৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব করেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের উপর সেনাবাহিনী গুলি চালিয়েছে, তার তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কোনো আলোচনায় যাবেন না। এ দিকে ৬ মার্চ '৭১ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙে কিছু রাজবন্দীসহ ৩২ জন কয়েদি পালিয়ে যান। এতে গুলিতে ৩৭ জন কয়েদি নিহত হন। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরেও প্রতিদিনই চলতে থাকে বিক্ষোভ মিছিল, লাঠি মিছিল ইত্যাদি। অন্য দিকে ইয়াহিয়া খান নৃশংসতার জন্য কুখ্যাত এক পাকিস্তানি সেনাপতি লে. জেনারেল টিক্কা খানকে একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সেনা প্রধান ও গভর্নর নিয়োগ



করে তাঁর মতলব সম্পর্কে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করেন, এতে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে।

এমনি এক আগুন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্সের জনসমুদ্রে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

**ভাষণ:** আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম?

নির্বাচনে বাংলার মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং দেশের ইতিহাসকে গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদএ দেশের ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব খাঁ মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনে আইয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খঁন বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি। আমি শুধু বাঙলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো– এমনকি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতও যদি ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেবো।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম। আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। সবাই আসুন, বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি! তিনি বললেন, যারা যাবে, তাদের মেরে ফেলে দেয়া হবে। আর যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত সব জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এসেম্বলি চলবে ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন

সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া, দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেয়া হলো আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে তার বুকের উপর চালাচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের উপর গুলি করা হয়েছে। কীভাবে আমার মায়ের বুক খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন। আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি কিসের এসেম্বলি বসবে? কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো। পাঁচ ঘণ্টা গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন, বলেছেন দায়ী আমরা।

২৫ তারিখে এসেম্বলি ডেকেছেন। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহিদের ওপর পাড়া দিয়ে, এসেম্বলি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথ্ড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এস্বেলিতে বসতে পারবো কিনা। এর পূর্বে এসেম্বলিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত, ফৌজদারী আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট ও সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা- কোনো কিছুই চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া



না হয়, এরপর যদি একটা গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তা ঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমাদের ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগ থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর সাত দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার দেশের মুক্তি না হচ্ছে তত দিন ওয়াপদার ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো- কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন। শত্রু পেছনে ঢুকেছে আমাদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই,- বাঙালি অ-বাঙালি তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে কর্মচারীরা টেলিভিশনে যাবেন না। দু'ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে-বাঙালিরা বুঝে সুজে কাজ করবে। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো। ইনশাহ আল্লাহ। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। "জয় বাংলা"।

৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নীতি নির্ধারণী ঐতিহাসিক ভাষণের পর বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সচেতন নাগরিক, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের বুঝতে বাকী থাকে না যে, এহেন সংকটময় মুহূর্তে তাঁদের করণীয় কি? তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে এসে

বললেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাহআল্লাহ। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

**১** মার্চ **১৯৭১** হতে ২৫ মার্চ **১৯৭১** পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাঙালি জাতি যেমন অসহযোগ আন্দোলনের সকল কর্মসূচী যথাযথভাবে সাফল্যের সাথে পালন করেন, তেমনি এদেশকে পাক-হানাদার মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে বাঙালি জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। রাতারাতি বহু পাকবাহিনী ঢাকায় আনেন। যার ফলে ২৬ মার্চ **১৯৭১** মধ্য রাতে (১২টায়) ঢাকাসহ সারা দেশে অতর্কিতে বর্বর ও পৈশাচিক আক্রমণ চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে, বিশেষ করে জগন্নাথ হলেই কয়েকশ ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করে গণ কবর দেয়া হয়। এছাড়া রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অতর্কিতে হামলা চালায়, পুলিশ বাহিনী প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারেনি। এখানেও কয়েকশ পুলিশকে গুলি করে হত্যা করে গণ কবর দেয়। এরপর পিলখানায় তৎকালীন ই.পি.আর বাহিনীর ওপর অতর্কিতে বর্বরোচিতভাবে হামলা চালিয়ে অসংখ্য ই.পি.আরকে গুলি করে হত্যা করে বাকীদের নিকট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়। এহেন অমানবিক ঘটনায় বাঙালি জাতি হতভম্ব হয়ে যায়। সেইসাথে প্রতিশোধ নেয়ার একটা অদম্য স্পৃহাও জাগ্রত হয়। জাতি বুঝতে পারে যে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, পিছানোর কোনো জায়গা নেই, পালানোর কোনো স্থান নেই, কাজেই সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।



## একাত্তরে বাতেন বাহিনী

**বাতেন বাহিনী গঠন :** এহেন যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের নেতা খন্দকার আবদুল বাতেন সা'দত কলেজ, করটিয়া মুসলিম হোস্টেলে অবস্থান করতে ছিলেন। ওখান থেকে ঢাকার সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং জেলার বিভিন্ন থানাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে বাঁশের লাঠি বানিয়ে শারীরিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকে। আমিও এলাসিন গিয়ে এলাসিন আঞ্চলিক (দ. টা.) স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাকর্মীদের নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করি। সেই সাথে বাঁশের লাঠি বানিয়ে এল্যাসিন প্লাটফরমে স্থান নির্ধারণ না করে দড়িপাড়ার মাঠে গিয়ে শারীরিক প্রশিক্ষণ নিতে থাকি।

২৬ মার্চ **১৯৭১** সকালে ই.পি.আর বাহিনীর ওয়ারলেস কর্তৃক ট্রান্সমিট করা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শেষবার্তা এস.এম. রহমান নামে খন্দকার আবদুল বাতেনের হস্তগত হয়। সেই বার্তা পেয়ে তিনি নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে বঙ্গের আলীগড় নামে খ্যাত সা'দত কলেজ, করটিয়াসহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বার্তা পাঠান। ৩ এপ্রিল '৭১ পাক-হানাদার বাহিনী টাঙ্গাইল শহরে প্রবেশ করার পর খন্দকার আবদুল বাতেন সশরীরে জেলার বিভিন্ন স্থানে একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার প্রত্যয়ে নিজের জীবনকে বাজী রেখে দ্রুতগতিতে তৎপর হয়ে উঠেন। এক পর্যায়ে নিজ গ্রাম- কোনড়া, থানা- নাগরপুর, জেলা- টাঙ্গাইল এ যান। দেশের এহেন উত্তপ্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাঁর গ্রামে আসার খবর পেয়ে গ্রামের কিছু তরুণ যুবকসহ অত্র এলাকার উল্লেখযোগ্য সচেতন দেশপ্রেমিক নেতৃস্থানীয় ছাত্র যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেতার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। সাক্ষাত করতে আসা ব্যক্তিবর্গ হলেন- (১) উপেন্দ্রনাথ সরকার (২) মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ (৩) আফতাব হোসেন আরজু (৪) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (৫) আবদুর রশীদ (৬) মো. বেল্লাল হোসেন দেওয়ান (৭) মো. জাহাঙ্গীর আলম (৮) মো. সুলতান উদ্দিন (৯) আব্দুল কুদ্দুছ (১০) কাজী ওয়াজেদ আলী (১১) খন্দকার আবদুস ছালাম (১২) খন্দকার আবদুল করীম চাতক (১৩) আবদুল লতিফ (১৪) খন্দকার আবদুল মান্নান ফিরোজ (১৫) মো. আবুল কালাম আজাদ শাজাহান (১৬) মো. শাহজাহান গেন্তা (১৭) মেজবাহ উদ্দিন নয়ন (আমি) (১৮) মীর সামছুল আলম শাহজাদা (১৯) মীর কায়সার (২০) মীর জাহাঙ্গীর (২১) আলী আকবর খান ডলার (২২) জহুরুল ইসলাম।

উপরোক্ত উপস্থিত সবাইকে নিয়ে খন্দকার আবদুল বাতেন দেশের উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতি, একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তিবাহিনী গঠন, এর সাথে গোয়েন্দা বিভাগ গঠন, বেসরকারি বিভাগ গঠন, ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দও তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। এই মতবিনিময় সভার সবার সম্মতিক্রমে খন্দকার আবদুল বাতেনকে উক্ত গঠিত মুক্তি বাহিনীর অধিনায়ক এবং প্রতিষ্ঠাতা নিয়োগ করা হয়। আর বাহিনীর নাম "বাতেন বাহিনী" রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হতে উপেন্দ্রনাথ সরকার, মীর সামছুল আলম শাহজাদা, মো. শাজাহান গেন্তা, মেজবাহ উদ্দিন নয়ন, মো. মুলতান উদ্দিনকে গোয়েন্দা বিভাগ গঠন প্রক্রিয়ার দায়িত্বে, আলী আকবর খান ডলারকে বেসামরিক বিভাগ এবং মো. জহুরুল ইসলামকে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের দায়িত্বে রেখে বাকীদের নিয়ে মূল বাহিনী গঠনের কার্যক্রম শুরু করেন বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন।

খন্দকার আবদুল বাতেনের মুক্তিবাহিনী গঠনের খবর পেয়ে এগিয়ে আসেন টাঙ্গাইল জেলার তৎকালীন নাগরপুর থানার লাউহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতোয়ার রহমান খান (কামাল খান)। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আতোয়ার রহমান খান (কামাল খান) খন্দকার আবদুল বাতেনকে ম্যাগজিন ছাড়া চারটি রাইফেলের সন্ধান দেন। এই রাইফেল চারটি লাউহাটীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম তারুটিয়ার এক ডোবায় পাট পচা পানির নিচ থেকে আবদুল বাতেন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তুলে আনেন। ম্যাগজিন ছাড়া চারটি রাইফেল আর এলাকার কয়েকজন দুঃসাহসী যুবকদের নিয়ে খন্দকার আবদুল বাতেন শুরু করেছিলেন মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার কাজ। তাঁর মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলার সংবাদ অতিদ্রুত বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আবদুল বাতেনের মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করার সংবাদ পাবার পর বিভিন্ন স্থান থেকে বহু দুঃসাহসী যুবক তাঁর সংগঠনে যোগদান করার জন্য ছুটে আসে। যেমনি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের ছাত্র আসতে শুরু করেছিল, তেমনি আসতে শুরু করেছিল কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ। এর পাশাপাশি আসতে থাকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য, ই.পি.আর বাহিনীর সদস্য পুলিশ ও আনছার বাহিনীর সদস্য। তাদের অনেকেই নিয়ে আসেন বিভিন্ন ধরণের আধুনিক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। সুদূর কালীহাতি হতে হুরমুজ আলী বি.এসসি বেশ কিছু যুবক নিয়ে অস্ত্রসহ এসে বাতেন বাহিনীতে যোগদান করেন। শাহজানী এলাকা থেকে মো. ছিদ্দিক বি.এসসিসহ অনেকেই এসে যোগদান করেন।

খন্দকার আবদুল বাতেনের মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার সংবাদ পেয়ে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার গজিয়াবাড়ী গ্রামের দুঃসাহসী যুবক ফজলুল হক একটি চাইনিজ



এল.এম.জিসহ কিছু অস্ত্র ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য আনোয়ার হোসেন, ইসমাইল হোসেন ঠান্ডুসহ বেশকিছু যুবকদের সঙ্গে নিয়ে বাতেন বাহিনীতে যোগদান করেন। আরো আসেন টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার পাকুল্যা গ্রামের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার আবদুল বারী, নায়েক আজহারুল ইসলাম ও ল্যান্স নায়েক মজিবর রহমান তালুকদার মন্টু। এ সমস্ত বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানরা বেশকিছু চাইনিজ রাইফেল, গোলাবারুদ ও অনেক গ্রেনেড নিয়ে আসেন। এ ধরণের বিভিন্ন শ্রেণির যুবকদের যোগদানের মধ্য দিয়ে বাতেন বাহিনী ক্রমশই শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হতে শুরু করে। বাতেন বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য আলী আকবর খান ডলার তাঁর এলাকা থেকে মহিদুর রহমান খান আলমগীর, আব্দুল আলীম খান, হাসমত আলী খান, হাসান, বাবুল, সেলিম, ইউনুসসহ অসংখ্য যুবককে এনে বাতেন বাহিনীতে ভর্তি করে দিয়ে বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করেন। এর ফলে বাতেন বাহিনীতে অসংখ্য যুবকের ভিড় জমে যায়। একদিকে বিভিন্ন স্থান থেকে যুবকদের আগমন অন্যদিকে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশ অস্ত্রশস্ত্রসহ আগমনে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খন্দকার আবদুল বাতেন এক বিশাল বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন। মাত্র চারটি রাইফেল আর কয়েকজন যুবককে নিয়ে বিশাল বাহিনী গড়ে তোলার পেছনে ছিল তাঁর একনিষ্ঠতা ও দক্ষ নেতৃত্ব। তিনি প্রবাসী সরকার কিংবা ভারতীয় সরকারের সহযোগিতা ছাড়াই নিজ শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা দিয়ে তাঁর বাহিনীকে শক্তিশালী করেন বিভিন্ন স্থান থেকে পাকহানাদার বাহিনীর অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে এনে।

খন্দকার আবদুল বাতেন একটি নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ মুক্তিবাহিনী গঠন করার প্রাথমিক পর্যায়ে একাকিত্বে ভাবতে ভাবতে তাঁর একজন একান্ত বন্ধু উপেন্দ্রনাথ সরকারকে ভাবনার অংশীদার করে ফেলেন। উপেন্দ্রনাথ সরকারের মতো একজন সাদামাটা নিরীহ ভদ্রলোক যতটা না দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার চেয়ে বেশি বন্ধুত্বের টানে অনুপ্রাণিত হয়ে পাক-হানাদার বাহিনীর মত বর্বর, দুর্ধর্ষ, জঘন্য মনোবৃত্তির সেনাদের বিরুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রীয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে বাতেন বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধ কার্যক্রম শুরুর আগ পর্যন্ত খন্দকার আবদুল বাতেনের সংগ্রহ করা অস্ত্র ও গোলাবারুদ অত্যন্ত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও উপেন্দ্রনাথ সরকার তা সংরক্ষণ করতেন। এ কাজে উপেন্দ্রনাথ সরকারকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছে ঐ গ্রামেরই ছেলে পল্টু সোম। খন্দকার আবদুল বাতেনের অসীম সাহস, প্রগাঢ় দেশপ্রেম, মনে প্রাণে বাঙালি, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনার ব্যাপারে আমি পূর্ব থেকেই অবগত ছিলাম। একদিন রাত দশটার পর খন্দকার আবদুল বাতেন উপেন্দ্রনাথ সরকারকে সাথে নিয়ে দুজনে দুটি সাইকেলে করে দেলদুয়ার উপজেলার সরাতৈল গ্রামের এক কুখ্যাত ডাকাতের নিকট থেকে দু'টি অস্ত্র সংগ্রহের জন্য

খালি হাতে লাউহাটী থেকে রওয়ানা দিয়েছিলেন। পথিমধ্যে পাক বাহিনীর কবলেও প্রায় পড়ে গিয়েছিলেন। অন্য একদিন লাউহাটী সংলগ্ন কোনাচিয়াপাড়া গ্রাম ধলেশ্বরী নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত, যেখান থেকে একটি ছোট নৌকা সংগ্রহ করলেন আবদুল বাতেন এবং উপেন্দ্রনাথ সরকার। একজন হাল ধরলেন অন্যজন বৈঠা যোগে বাইচ দিয়ে যাবেন নদীর পশ্চিম পাড় সাতুটিয়া গ্রামে নন্দী বাড়ী, উদ্দেশ্য অস্ত্র সংগ্রহ। নদীতে প্রচণ্ড স্রোত, এর মধ্যেও "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে রওয়ানা দিলেন। আবার সেখান থেকে ভোর হওয়ার আগেই দু'জনে বর্ণী গ্রামে ফিরে এলেন। এছাড়া আবুল কালাম আজাদ শাজাহান, খন্দকার আবদুল মান্নান ফিরোজকে সাথে নিয়েও খন্দকার আবদুল বাতেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুদূর পাহাড় এলাকা থেকে শুরু করে চর, ভর এলাকা চষে বেড়িয়েছেন অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ অভিযানে। বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে মুজিবনগর সরকার কিংবা ভারতীয় সরকারের সহযোগিতা ব্যতিরেকে খন্দকার আবদুল বাতেন একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তিবাহিনী গঠনকল্পে কি যে অমানসিক, অকল্পনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছিলেন, তার কতটুকুই বা আমি জানি, আর কতটুকুই বা লিখে প্রকাশ করতে পারবো। বাতেন বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণ করা ছাড়াও খন্দকার আবদুল বাতেন উপেন্দ্রনাথ সরকার (বর্তমান অবসর প্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী সচিব) কে তাঁর বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। উপেন্দ্র নাথ সরকার নিরীহ সাদামাটা ভদ্র লোক হয়েও বাতেন বাহিনী প্রধানের দেয়া উক্ত কঠিনতম দায়িত্বটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আসলে জাতি সংকটাপন্ন হলে, সংকটকালীন বাস্তব পরিস্থিতিতে, দেশ মাতৃকার সেবায় সচেতন মানুষ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, কর্তব্য পরায়ণ ও সাহসী হয়ে উঠেন।

**বাতেন বাহিনীর গঠন কাঠামো : ১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাতেন বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাহিনীর অধিনায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা খন্দকার আবদুল বাতেনের নামানুসারে এই বাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় "বাতেন বাহিনী" নামে খ্যাতি লাভ করে। বাতেন বাহিনী পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অজস্র হানাদার সৈন্য ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর ও মিলিশিয়াদের নিধন করে। দক্ষিণ টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার অন্তর্গত একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল, অজপাড়া গাঁও, বাহিনী প্রধানের জন্মস্থান, সৌভাগ্যক্রমে আমারও জন্মস্থান কোনড়া গ্রামকে কেন্দ্র করে এই ঐতিহাসিক মুক্তিবাহিনী বাতেন বাহিনী গড়ে উঠলেও এই বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি ছিল সমগ্র দক্ষিণ টাঙ্গাইল, ঢাকা জেলার কিছু অংশ,



গাজিপুর জেলার কিছু অংশ, মানিকগঞ্জ জেলার সমগ্র উত্তরাঞ্চল, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার ব্যাপক অংশ।

বাতেন বাহিনীর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধের মধ্যে ছিল, মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানা আক্রমণ, দৌলতপুর থানা আক্রমণ, ঘিউর থানা আক্রমণ, সাটুরিয়া থানা দুইবার আক্রমণ, সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী থানা আক্রমণ, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানা মুক্ত করা, ধল্লা ব্রিজে রাজাকারের উপর হামলা, মানিকগঞ্জের জাব্রা ব্রিজের নিকট হানাদারদের গানবোট আক্রমণ, মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানা ও শিবালয় থানা আক্রমণ, খাসকাউলিয়া রাজাকার নিধন। এছাড়া ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার কোনড়া গ্রামে পাকবাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী সম্মুখ যুদ্ধ।

বাতেন বাহিনীতে সাড়ে তিন হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। একুশটি কোম্পানি সমন্বয়ে বাতেন বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এই বাহিনীতে ৬৩টি প্লাটুন, একশতটি সেকশন এবং প্রায় আট হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহযোগী সদস্য। বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার ছিলেন সুবেদার মেজর এ.কে.এম আবু তাহের। কোম্পানি কমান্ডারগণ: (১) সুবেদার আবদুল বারী (২) নায়েক হুমায়ূন খান (৩) নায়েক আব্দুস সামাদ (৪) নায়েক সিরাজুল হক খান (৫) নায়েক ওয়াজেদ আলী খান (৬) নায়েক আবুল খায়ের (৭) সুবেদার আলমগীর (৮) মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ (৯) মো. হুমায়ুন কবীর খান (১০) মো. ইন্তাজ আলী (১১) মো. আবদুস সামাদ (১২) মো. ওয়াজেদ আলী খান (১৩) মো. আবদুস সামাদ (১৪) মো. বেল্লাল হোসেন দেওয়ান (১৫) মো. নূরুল ইসলাম (১৬) আমিনুর রহমান খান (১৭) মো. আফজাল হোসেন (১৮) মো. আল্লাদ খান (১৯) মীর জাহাংগীর হোসেন (২০) মো. আবু কায়সার (২১) মো. কফিল উদ্দিন। এই বাহিনীর তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল (১) মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার তিল্লী গ্রাম (২) টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার অন্তর্গত লাউহাটী গ্রাম (৩) টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার অন্তর্গত শাহজানীর চর। বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ বিভাগ ছিল। এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সুবেদার মেজর এ.কে.এম আবু তাহের, সুবেদার আবদুল বারী, সুবেদার আলমগীর, নায়েক ওয়াজেদ আলী খান, নায়েক আবুল খায়ের। বাতেন বাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার ছিলেন খন্দকার আবদুল করিম চাতক, কোষাধ্যক্ষ ছিলেন আবদুল লতিফ। পুরো বাহিনীর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাহিনী প্রধানের নির্দেশে হেড কোয়ার্টার গঠন করা হয়। উক্ত হেড কোয়ার্টারে বাহিনী প্রধান ফিল্ড কমান্ডার, কোয়ার্টার মাস্টার, বেসামরিক প্রধান, গোয়েন্দা প্রতিনিধি, কোষাধ্যক্ষ প্রমুখ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ অবস্থান করতেন।

**গোয়েন্দা বিভাগ :** বাতেন বাহিনীর যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিধি ছিল সমগ্র দক্ষিণ টাঙ্গাইল, ঢাকা জেলার কিছু অংশ, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ জেলার ব্যাপক অংশ। বাতেন বাহিনীর মূল কাঠামো গঠিত হওয়ার পর বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন ভেবে চিন্তে উপলব্ধি করলেন যে, এখন তাঁর বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধিব্যাপী একটি সুশৃঙ্খল গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। অত্র নির্ধারিত এলাকার শিক্ষিত যুবসমাজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি সুশৃঙ্খল গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে তুলতে পারলে, মূল বাহিনীকে বাহির থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবে, বাহিনীর অভ্যন্তরে বাহিনীর জন্য ক্ষতিকর কোনো চিন্তা ভাবনা কাজ করে কিনা, বাহিনী প্রধানের বিরুদ্ধে কেউ কোনো ষড়যন্ত্র করে কি না, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোনো শক্তির উদ্ভব হয় কিনা তার দেখভাল করতে পারবে। আর যুদ্ধক্ষেত্রে বাহিনীর অপারেশনাল কাজে অনুসন্ধানী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

এই পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন উপেন্দ্রনাথ সরকারের সাথে মতবিনিময় করে উপেন্দ্রনাথ সরকারকে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা (Chief Sicurity Officer) হিসাবে নিয়োগ দিয়ে গোয়েন্দা বিভাগের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এরপর মীর শামসুল আলম শাহজাদাকে নিরাপত্তা কর্মকর্তা (Sicurity Officer) হিসেবে নিয়োগ দেন। তারপর একদিন বাতেন বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন আমাকে (মেজবাহ উদ্দিন নয়ন) ও মো. শাহজাহান গেন্তাকে ডেকে পাঠান। তখন ছিল বর্ষাকাল, কোনড়া গ্রামে পানি কেবল প্রবেশ করেছে। সংবাদদাতা বলল, নাদের আলীর বাড়ির ঘাটে এক মালিয়া ছৈআলা একটি ছোট নৌকায় তিনি বসে আছেন। আমরা সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই চলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক, হাতের কাছে একটি অত্যাধুনিক রিবলভার, পাশে বাহিনীর নিয়োগ পত্রসহ সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। বলতে গেলে পুরো অফিস তাঁর সাথে। দু'জনে সালাম দিয়ে নৌকায় উঠলাম। কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাদের সাথে গোয়েন্দা বিভাগকে নিয়ে তাঁর পুরো পরিকল্পনা, আমাদের দু'জনের করণীয়, কোন ধরণের যুবককে নিয়োগ দিতে হবে, কি ধরণের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, এদের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে অন্তত দশজন করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলাসহ যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, সকল কার্যক্রমই উপেন্দ্রনাথ সরকারের সাথে পরামর্শ করে করতে হবে। আলোচনার এক পর্যায়ে আমাদের দুজনকে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে (Information Officer) নিয়োগ দেন। খন্দকার আবদুল বাতেন আরও বলেছিলেন, উপেন্দ্রনাথ সরকার গোয়েন্দা বাহিনীর সাংগঠনিক কাজে বাইরে যেতে



পারবেন না। তাঁর মূল দায়িত্ব বাহিনীর অভ্যন্তরের সমস্যাদি দেখাশুনা করা এবং তাদের পরিচালনা করা।

একটি সুদক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেনের ছিল, যা তিনি আমাদের দু'জনকে দীর্ঘক্ষণ সময় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রশিক্ষণাকারে বুঝিয়েছিলেন, অন্তত কিছুটা হলেও আমরা দুজনে তা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম। দেশেপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অনুপ্রাণিত হয়ে, বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠকীর্তি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে, আমাদের প্রিয় বাহিনীর প্রধানের আদেশকে পুঁজি করে আমাদেরকে দেয়া দায়িত্ব নানা অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতার মধ্যেও সাধ্যানুসারে পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। তিনি গোয়েন্দা বাহিনী গঠন কল্পে একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা, গোয়েন্দা বাহিনীর নিরাপত্তা কর্মকর্তা, তথ্য কর্মকর্তাসহ তথ্য সংগ্রহকারী, সংবাদ আদান প্রদানকারীসহ সারা গোয়েন্দা বাহিনীর কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত তাদের করণীয়, আচরণবিধি ইত্যাদি ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিলেন। শিক্ষিত যুবসমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে পড়ুয়া ছাত্র, কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষকদের মধ্য হতে আমাদের বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রের নির্ধারিত প্রতিটি এলাকায় প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে ৫ জন করে তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহকারী সংগঠক হিসেবে দেখে বুঝে, দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবো কিনা তা অনুধাবন করে নিয়োগ দিয়ে, তার মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদানকারী নিয়োগ করত উক্ত ইউনিয়নে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরামর্শ দেয়া। সেই সাথে উক্ত তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহকারীর মুক্তিবাহিনীর সাথে সম্পৃক্ততা গোপন রেখে সহযোগী হিসাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রতিটি গ্রামে গড়ে তুলতে হবে।

গোয়েন্দা প্রধান উপেন্দ্রনাথ সরকারের নির্দেশক্রমে গোয়েন্দা বাহিনীর একটি নিজস্ব ভ্রাম্যমাণ অফিসের ব্যবস্থা করা হয়, যার মাধ্যমে নির্ধারিত এলাকার গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখা সহজ হয়। এতে একজন করণিক, একজন সহকারী করণিক ও একজন পিয়ন নিয়োগ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, বাহিনী প্রধানের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ ছিল, গোয়েন্দা বাহিনীর সকল কর্মকর্তাসহ এই সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে জড়িত তারা কেউই মুক্তিবাহিনী হিসেবে জনতার মাঝে পরিচয় দিতে পারবে না। এমনকি বাতেন বাহিনীর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিকটও পরিচয় গোপন রাখতে হবে। অর্থাৎ গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যরা পাক বাহিনীর দোসর রাজাকার, আলবদর, দালাল, শান্তি কমিটির লোকদের চিনবে কিন্তু কেউই এদের চিনতে পারবে না, এটাই যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ম এবং তা মেনে চলতে হবে।

**গোয়েন্দা বাহিনীর কার্যাবলী :** (১) বাহিনী প্রধান, বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার, কোম্পানি কমান্ডার কোনো থানা আক্রমণ, ক্যাম্প আক্রমণ বা যে কোনো যুদ্ধ পরিকল্পনা করার পর তা গোয়েন্দা বিভাগকে অবহিত করার সাথে সাথে গোয়েন্দা বিভাগ অনুসন্ধানী টিম পাঠিয়ে অনুসন্ধান করে তার রিপোর্ট অপারেশনাল কমান্ডারের নিকট পাঠানো। (২) বাতেন বাহিনীর যুদ্ধকালীন নির্ধারিত এলাকার স্বাধীনতা বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রণয়ন করে বাহিনী প্রধানের নিকট প্রেরণ করা। (৩) বাতেন বাহিনীর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা গোয়েন্দা বিভাগের দেয়া তালিকা অনুসারে বিভিন্ন এলাকার গ্রামগুলোর উল্লিখিত বাড়িতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বাহিনীর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দেবে।

বাতেন বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী গোয়েন্দা বাহিনী গঠনের রূপরেখা, কার্যাবলী, আচরণবিধি সম্পর্কিত নির্দেশনার আলোকে উপেন্দ্রনাথ সরকারের সাথে আলোচনা পর্যালোচনা করে আমি এবং মো. শাহজাহান গেন্তা গোয়েন্দা বাহিনী গঠনের কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। সূচনালগ্নে গোয়েন্দা বিভাগের ভ্রাম্যমাণ অফিসের কার্যক্রম টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার, লাউহাটী ইউনিয়নের ভেংগুলিয়া গ্রামে শুরু করেছিলাম। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন গ্রামে অবস্থাভেদে স্থানান্তর করা হয়। উক্ত অফিসে সকালে উপস্থিত হয়ে, হাজিরা দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গঠনকল্পে চলে যেতাম। কোনো কোনো সময় ২/৩ দিন পরে এসে অফিসে রিপোর্ট করতাম। গোয়েন্দা বিভাগের অফিসকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম একে দিন একেক দিকে ভাত খেয়ে রওয়ানা হতাম। কোনো দিন দুপুরে খাওয়া জুটতো আবার কোনো দিন জুটতোও না। প্রতিদিন একনাগাড়ে ৩০, ৪০, ৫০ মাইল পায়ে হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ইউনিয়ন এর পর ইউনিয়ন, এক থানা থেকে আর এক থানা পাড়ি দিয়ে গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে রাত অনুমান ১০/১১টার দিকে একটি অচেনা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হতাম। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা, শাজাহান তাঁর ধুরন্ধর বুদ্ধি খাঁটিয়ে একটি বাড়িতে রাত্রে থাকা খাওয়া, আবার সকালে উঠে গোসল সেরে খেয়ে বের হওয়া পর্যন্ত সময়ে ঐ বাড়ি বা আশেপাশের বাড়ি হতে ২/৩ জনকে গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে ফেলতো। প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একজন প্রতিটি ইউনিয়নে পাঁচজন, এদের নেতৃত্বে প্রতি গ্রামে কমপক্ষে দশজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হতো। এই ভাবে এক/ দেড় মাস আমরা দু'জনেই কাজ চালিয়ে যেতে থাকলাম। এক পর্যায়ে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার সহবতপুর ইউনিয়নের সারাংপুর গ্রাম-এর খন্দকার লুৎফর রহমান মিন্টু গোয়েন্দা বিভাগে নিয়োগ পান। তখন পুরোপুরি বর্ষাকাল, তাকে নিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল যেমন- ছপকা,



বরাইদ, দহগ্রাম, ঘিউর থানার বিভিন্ন গ্রাম নৌকাযোগে কাজ করেছি। এছাড়া দৌলতপুর ও সিংগাইর থানার বিভিন্ন গ্রামে মিন্টুভাইকে নিয়ে কাজ করেছি। লুৎফর রহমান মিন্টু গোয়েন্দাবাহিনী গড়ার কাজে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। এরপর কোনো এক সময় উক্ত সহবতপুর ইউনিয়নের মূলতান উদ্দিনকে নিয়োগ দেয়া হয়। তবে তাকে কাজে পাওয়া যেত কম। যাহোক, এদের সবাইকে নিয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করার ফলে দেড়, দুই মাসের মধ্যে বাতেন বাহিনীর নির্ধারিত এলাকাসমূহের প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়নসহ গ্রাম পর্যায়ে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক মোটামুটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের দুইমাসের কার্যক্রমের একটি সারসংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে উপেন্দ্রনাথ সরকারের মাধ্যমে বাতেন বাহিনী প্রধানের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাতেন বাহিনীর নির্ধারিত বিচরণ ক্ষেত্র ব্যাপী গোয়েন্দা বিভাগে যে সমস্ত চৌকস ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দেয়া হয়, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

মো. আবদুল গফুর খান, আমিনুল ইসলাম খান, মো. আলী আজগর, মো. সহিদুল ইসলাম, মো. ইউনুস খান, খ. ফজলুল হক, রোস্তম মাস্টার, আবদুল আলীম খান সেলিম, মো. খলিলুর রহমান, শহীদুল হক খান মল্লিক, মানিক তালুকদার, খালেদ খান যুবরাজ, আবদুস ছালাম ভূঁইয়া, খন্দকার আবদুল মান্নান, মো. সামসুল আলম, নূরুল ইসলাম, আবদুর রশীদ, মো. নূরুল ইসলাম, এস. এম. সামছুল হুদা, আবদুল আওয়াল, অধ্যাপক আলী হাসান, আবদুল হালীম, এম.এ খালেক, শ্রী রনজিৎ সোম, ড. মো. শাহজাহান, মো. হাসমত আলী খান, খোরশেদ আলম, মো. শফিক আহমেদ, আবদুল হামীদ, মো. আওলাদ হোসেন, আশরাফ উদ্দিন খান, মীর ছানোয়ার আলী, শাজাহান মাস্টার, জসিম উদ্দিন মাস্টার, মালেক মাস্টার, হাসমত আলী, জামাল উদ্দিন ভূইয়া, মো. কছিম উদ্দিন, সহিদুর রহমান খান আলমগীর, নৈমুদ্দিন, ওয়াজেদ আলী, দেলোয়ার হোসেন খান চারু, মো. আজহার আলী, মো. জোম্প আলী, মো. রফিকুল ইসলাম খান, আবুল হাশেম খান, মো. রেজাউল বারী খান, মোয়াজ্জেম হোসেন, আবদুল বাছেদ খান, মনীন্দ্র রায় ওরফে ফকির চাঁন, মধুসুদন মণ্ডল, মো. ছুরমান আলী, মো. আফতাব উদ্দিন, মো. এনায়েত হোসেন।

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে আহত কিংবা অসুস্থ বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার নিমিত্তে বাহিনীর একটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল ছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের দক্ষ চিকিৎসক ডা. জহিরুল ইসলাম। সহকারী চিকিৎসক হিসেবে ছিলেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ডাক্তার বসন্ত কুমার সাহা এবং সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসক ডা. নিখিল চন্দ্র সাহা। হাসপাতালের সেবিকা (নার্স) হিসেবে ছিলেন মায়া রাণী (আংগুরী) সরকার, নিভা রাণী সোম, মায়া রাণী নাগ।

বাতেন বাহিনীর নির্ধারিত এলাকায় দেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনের যুদ্ধসহ নানা প্রকারের সংবাদ জনসমক্ষে ব্যাপক প্রচার ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে "অগ্নিশিখা" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হতো।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহান মুক্তিযুদ্ধে বাতেন বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার লাউহাটী থেকে বাতেন বাহিনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছাত্র যুবকদের রিক্রুট করে ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। তবে ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরতে তাদের বিলম্ব হয়। বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর প্রয়োজনে যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ভারতে চলে যান। তিনি ভারতে যাওয়ার কিছুদিন পর খন্দকার আবদুল মান্নান ফিরোজের নেতৃত্বে ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৮৬ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ বাংলাদেশে এসে বাতেন বাহিনীতে যোগ দেয়। অতঃপর বাতেন বাহিনীর মাধ্যমে রিক্রুট করে পাঠানো ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরও একটি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের (এম.এন.এ) নেতৃত্বে বাতেন বাহিনীতে যোগ দেন। যোগদানের একদিন পর টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার পাকুটিয়া জমিদার বাড়ির খেলার মাঠে মুক্তিযোদ্ধা জনতার এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে শওকত ব্যারিস্টারসহ অন্যান্য বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ বক্তব্য পেশ করেন।

খন্দকার আবদুল মান্নান ফিরোজের নেতৃত্বে আসা ৮৬ জনের গ্রুপের একজন অপ্রাপ্ত বয়সের বীর মুক্তিযোদ্ধা, যার নাম শাজাহান, গ্রাম পাহাড়পুর, ইউনিয়ন-লাউহাটী, উপজেলা- দেলদুয়ার, জেলা- টাঙ্গাইল। শাজাহানের নামে বরাদ্দ করা (৩০৩) থ্রি নট থ্রি রাইফেলটি কাঁধে নিয়ে সোজা হেঁটে যেতে পারছিল না। ঐ রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ করবে কীভাবে? ওকে আমার কাছে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তোমার বাবা-মা তোমাকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে দিতে রাজি হয়েছিল?" উত্তরে শাজাহান বলেছিল, "আমি বাবা-মাকে বলে যাইনি, চাল চুরি করে বিক্রি করা টাকা দিয়ে ভারতে গিয়েছিলাম যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য।" শাজাহান তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এরপর আমি বাতেন বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার আজহারুল ইসলামকে বলে শাজাহানকে একটি হাল্কা আগ্নেয়াস্ত্র দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম।

এতে এটাই প্রমাণিত হয়, যে একজন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া কিশোর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে, দেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়, সে জাতি কখনও হারতে পারে না।



'৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে কুখ্যাত পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাতেন বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন-এর সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত। **মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিক থেকেই পাকহানাদার বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনার সূত্রপাত ঘটান। সূচনালগ্নে বাহিনী প্রধান মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানা আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা তাঁর গোয়েন্দা প্রধানকে অবহিত করেন। গোয়েন্দা প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর গোয়েন্দা শাখার অন্যতম চৌকস কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাজাহান গেন্তার নেতৃত্বে পরিচালিত একটি টিমের মাধ্যমে আক্রমণস্থল সিংগাইর থানা সরেজমিনে রেকী করে, পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বাহিনী প্রধানের নিকট প্রেরণ করেন। আমার জানামতে, খন্দকার আবদুল বাতেন গোয়েন্দা রিপোর্ট হাতে পাবার পর তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখে বুঝে, পুনরায় তাঁর নির্ধারিত লোক পাঠিয়ে কিংবা নিজে সরাসরি রেকী করে চূড়ান্ত আক্রমণে যেতেন।

৪ মে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধকালীন খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর নেতৃত্বে বাহিনী নিয়ে সিঙ্গাইর থানা আক্রমণ করেন। উক্ত আক্রমণটি বাতেন বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধ ছিল। পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিংগাইর থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে বাহিনী প্রধান নৌকাযোগে তাঁর বাহিনী নিয়ে সিংগাইর প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুবেদার আবদুল বারী, আবুল কালাম আজাদ শাজাহান, মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, মো. ফজলুল হক মল্লিক, আবদুর রশিদ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আফতাব হোসেন আরজু, নায়েক আবদুস সামাদ, হরমুজ আলী বিএসসি, নায়েক আজাহার, নায়েক হুমায়ূন, নায়েক আলাউদ্দিন, নায়েক সিরাজুল হক, ইপিআর বাহিনীর সদস্য বাবুল চৌধুরীসহ আরও অনেকে। বর্ষাকাল, থানার চতুর্দিকে থৈ থৈ পানি, ঝড়-বৃষ্টির সেই দুর্যোগময় ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে ১১টার সময় সিঙ্গাইর থানাস্থ হানাদার বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করা হয়। খন্দকার আবদুল বাতেন ও সুবেদার আবদুল বারীর যৌথ নেতৃত্বে বাতেন বাহিনীর দুটো দল সিঙ্গাইর থানা আক্রমণ করে। বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর হাতের চাইনিজ স্টেনগান দিয়ে গুলি ছুঁড়ে আক্রমণের সূচনা করেন। অধিনায়কের গুলি ছুঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীর সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র হতে একযোগে গুলি বর্ষণ হতে থাকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বিমুখী আক্রমণের চাপে পাক-হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা ও তাদের সহযোগী পুলিশ সদস্যরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এখানে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাক-বাহিনীর দু'ঘণ্টা ব্যাপী প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এহেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাক-হানাদার বাহিনীর প্রচুর জীবন হানি ঘটে। মরণপণ যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাক-হানাদার বাহিনীর সেনা,

মিলিশিয়া, পুলিশ মৃত দেহ, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রেখে পালিয়ে যায়। পাক-হানাদার সৈন্য ও পুলিশ পালিয়ে যাবার পর সিংগাইর থানা সাময়িক বাতেন বাহিনীর দখলে আসে। দখলে আসার পর সেখান থেকে বাতেন বাহিনীর তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে ঐ যুদ্ধে ভাগ্যের জোরে অল্পের জন্য জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন মো. ফজলুল হক মল্লিক। কারণ তিনি যখন গুলি ছুঁড়ে ক্রলিং করে থানার উপকণ্ঠে উপস্থিত হন, তখন পেছন থেকে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। যা বিস্ফোরিত হবার মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি দূরে চলে যান। সিংগাইর থানা পতনের পর ভোর ৬টার দিকে দু'টি সাবর জেট জঙ্গী বিমান থানা আক্রমণকারী বাতেন বাহিনীর উপর দিয়ে উড়ে যায়। প্রথম বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা মনে করেন বিমান দুইটি আর হয়তো ফিরে আসবে না। কিন্তু দেখা গেলো বিমান দু'টি উপর দিয়ে বার বার ড্রাইভ করা শুরু করলো। বিমানের উড়া দেখে সুবেদার আবদুল বারী বিমান দু'টিকে গুলি করার জন্য বাহিনী প্রধানের নিকট অনুমতি চান। অধিনায়কের অনুমতি পেয়ে সুবেদার আবদুল বারী ও নায়েক আজহার জি-থ্রি দিয়ে বিমান দু'টিকে গুলি করেন। জি- থ্রি'র গুলির মুখে বিমান দু'টি অতিদ্রুত স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। সিংগাইর থানা আক্রমণ করে সফলতা অর্জন করায় বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের মনে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় কুখ্যাত পাক হানাদার নিধনে।

বাতেন বাহিনীর আরো একটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ছিল মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানা আক্রমণ। ১৭ মে/৭১ খ্রিস্টাব্দে বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন দৌলতপুর থানা আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে তাঁর বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকারকে অবহিত করেন। শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর বিভাগের অন্যতম কর্মকর্তা মুলতান উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা টিম পাঠিয়ে আক্রমণস্থল দৌলতপুর থানা রেকী করে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বাহিনী প্রধানের নিকট প্রেরণ করেন। বাহিনী প্রধান রিপোর্টটি হাতে পেয়ে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দৌলতপুর থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন নৌকা যোগে তাঁর বাহিনী নিয়ে দৌলতপুর প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুবেদার মেজর এ.কে.এম আবু তাহের, সুবেদার আবদুল বারী, আবুল কালাম আজাদ শাজাহান, মো. ছিদ্দিক হোসেন বিএসসি, মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, মো. বেল্লাল হোসেন দেওয়ান, মো. জাহাঙ্গীর আলম, আবদুল কুদ্দুস, আবদুর রশীদ, নায়েক আলাউদ্দিন, নায়েক সিরাজুল হক, নায়েক মীর কায়সারসহ আরো অনেকে। বর্ষাকাল, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, গাঢ় অন্ধকার, রাত দুইটার সময় বাহিনী প্রধানের নেতৃত্বে বাতেন বাহিনীর অকুতোভয় দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা দৌলতপুর থানা আক্রমণ করে।



হানাদার বাহিনীর মিলিশিয়া ও পুলিশ বাহিনীর লোকজনরা দৌলতপুর থানার প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের তিন ভাগে ভাগ করে, প্রথম ভাগের নেতৃত্ব দেন বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন, দ্বিতীয় ভাগের নেতৃত্ব দেন এ.কে.এম আবু তাহের, তৃতীয় ভাগের নেতৃত্ব দেন আবদুল বারী। থানার তিন দিক থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। বাহিনী প্রধান গুলি ছুঁড়ে আক্রমণ করার সংকেত দেয়ার সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি চালাতে থাকেন। তিন ঘণ্টা ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ হবার পর হানাদার বাহিনীর সেনা, মিলিশিয়া, পুলিশ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। দৌলতপুর থানায় বাতেন বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা ১৮ মে/৭১ সকাল নয়টার দিকে দৌলতপুর থানা ত্যাগ করে চলে আসে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের কৌশল ছিল শত্রুকে আঘাত করে সরে পরা।

বাতেন বাহিনীর কৃতিত্বপূর্ণ অভিযানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল মানিকগঞ্জ জেলার ঘিউর থানা দখল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ২১/২২ তারিখের দিকে বাতেন বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন মানিকগঞ্জ জেলার ঘিউর থানা আক্রমণের ব্যাপারে পরিকল্পনা করে তাঁর বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগকে অবহিত করেন। গোয়েন্দা প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর সংস্থার চৌকস কর্মকর্তা মো. শাজাহান গেন্ডা অপর কর্মকর্তা খন্দকার লুৎফর রহমান মিন্টুর নেতৃত্বে ঘিউর থানার অভ্যন্তরস্থ কাঠামো, থানার ভেতরে হানাদার বাহিনীর পুলিশ, মিলিশিয়াসহ সৈন্য সংখ্যা অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ, বাংকারসহ অন্যান্য অবস্থান, থানার চতুর্দিকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জনমত, রাস্তাঘাটের অবস্থা, রাজাকার আলবদরদের বাড়ি ইত্যাদি বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে তা বাহিনী প্রধানের নিকট প্রেরণ করেন। ঘিউর থানা অভিযান ছিল প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধের গেরিলা কৌশল। গোয়েন্দা রিপোর্টটি হাতে নিয়ে বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন এক মাল্লা চালিত একটি নৌকায় ৩/৪ জন সাহসী মুক্তিযোদ্ধাসহ ঘিউর থানার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ, অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে পাক-হানাদার সৈন্যদের যাতায়াত ও আনাগোনা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে যান। ঘিউর থানার অবস্থান, থানায় শত্রুপক্ষের শক্তি, হানাদার বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের প্রকৃতি, জনগণের মানসিকতা এবং যোগাযোগের অনুকূল পরিবেশ লক্ষ্য করে খন্দকার আবদুল বাতেন ঘিউর থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর একেএম আবু তাহেরের নেতৃত্বে এক কোম্পানি এবং বাতেন বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবদুল বারীর নেতৃত্বে অপর একটি কোম্পানিকে ডেকে পাঠান বাহিনী প্রধান খন্দকার

আবদুল বাতেন। আক্রমণের দিনটি ছিল ঘিউর হাটের দিন। হাটে প্রচুর ছাগল ভেড়া বেচাকেনার জন্য আনা হয়েছিল। বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন ছদ্মবেশে হাটে উপস্থিত হয়ে থানার বাংকারগুলোর অবস্থান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শত্রু সৈন্যের সংখ্যা নিজে স্বশরীরে প্রত্যক্ষ করেন। হাটে ছাগল- ভেড়ার সংখ্যা দেখে অধিনায়কের মাথায় নতুন ধরনের রণকৌশলের আবির্ভাব ঘটে। সন্ধ্যার আগেই আগত দুই কোম্পানির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের "শর্ট আর্মসে" সজ্জিত করা হয়। এরপর প্রত্যেকে তরকারীর ঝাঁকা মাথায় নিয়ে হাটে প্রবেশ করেন। তার আগেই ছাগল ভেড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাহিনী প্রধানের আলোচনা হয়। দেশ ও জাতির মুক্তির প্রশ্নে তারা বাতেন বাহিনীকে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে রাজী হয়। সন্ধ্যা সমাগত, এমন সময় একদল ছাগল- ভেড়া নিয়ে সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা তরকারীর ঝাঁকা মাথায় থানার দিকে অগ্রসর হয়। গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশলগত কারণে ছাগল- ভেড়ার দলকে থানার ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। এতে থানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ছাগল- ভেড়া ফিরিয়ে আনার অভিনয় করে থানায় প্রবেশ করে ঝাঁকা মাথায় বাতেন বাহিনীর দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা। তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত চমকপ্রদ। বিনা গুলিতে, বিনা রক্তপাতে ঘিউর থানা বাতেন বাহিনীর দখলে চলে আসে। এখানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বাতেন বাহিনীর হস্তগত হয়। যা পরবর্তীতে বাতেন বাহিনীকে ব্যাপক শক্তিশালী করে তোলে। অভিযান শেষে ছাগল- ভেড়া একত্রিত করে ব্যবসায়ীদের পৌঁছে দেয়া হয়। সন্ধ্যার আঁধারে হাট চলছিল, হাটে কেনা বেচায় জনতা ব্যস্ত থাকায় তারা জানতেই পারলো না, আধাঘণ্টার মধ্যে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা ঘিউর থানা দখল করে নিয়েছে। হাটের বেচা- কেনায় ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় তার জন্য জয় বাংলা বা জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান দেয়া হয়নি। ছাগল- ভেড়া মালিকদের নিকট পৌঁছে দিয়ে চিড়া, মুড়ি, গুড়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ীর বেশে দূরে অবস্থিত নৌকাগুলোতে উঠে পড়েন। এরপর ছিপ নৌকা বাইচ দিয়ে তারা রওয়ানা হন তাঁদের হেড কোয়ার্টারের দিকে।

বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের শেষের দিকে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী থানা আক্রমণ করে। বাহিনী প্রধান চৌহালী থানার একটি গ্রামে ১৫ পেটি চাইনিজ এলএমজি এবং রাইফেলের গুলি আছে। এ সংবাদ বাতেন বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে পাবার পর বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন বড় একটি ছিপ নৌকায় তাঁর বাহিনীর বেশ কয়েকজন দুর্ধর্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে চৌহালীর দিকে যাত্রা করেন। ঝড় বৃষ্টির প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যে ধলেশ্বরী নদী পাড়ি দিয়ে যমুনা নদী হয়ে চৌহালী থানার উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। ছিপ নৌকাটি থানার অতিসন্নিকটে রেখে



বাহিনীর বিশজন মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি উদ্ধার করার জন্য পাঠানো হয়। অধিনায়কসহ মাত্র পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা বৃষ্টির মধ্যে নৌকায় অবস্থান করেন। হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর আলোয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে পড়ে চৌহালী থানা। তাঁরা দেখতে পান মাত্র ৫০ গজ দূরেই চৌহালী থানা। থানার এতো কাছে অবস্থান করে নিজেদের বিপদ হতে পারে ভেবে, দূরে সরে যাবার চিন্তা ভাবনা করেন, কিন্তু তাও সম্ভব নয়। কারণ অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ফেলে দূরে যাওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি প্রাকৃতিক কারণে মাত্র ৪ জনের পক্ষে ছিপ নৌকা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় বাহিনীর অধিনায়ক থানায় পাক হানাদার বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য চিন্তা করেন এবং নায়েক আজহারকে নির্দেশ দেন থানার খোঁজ খবর আনার জন্য। নায়েক আজহার অধিনায়কের নির্দেশ অনুযায়ী ক্রলিং করে থানার ভিতরে যান। তিনি সেখানে দেখতে পান দুটি বাংকার থানার সামনে, যা বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে গেছে, কোনো সেন্ট্রিও নেই। থানায় অবস্থানরত সকল পাকহানাদার সৈনিকেরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। থানার এহেন অবস্থা সরেজমিনে দেখে, এসে নায়েক আজহার তা অধিনায়কের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা দেন।

বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন থানার অবস্থা নায়েক আজহারের নিকট থেকে বিস্তারিত শুনে, এ ধরণের সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করতে কোনোক্রমেই ইচ্ছুক নন। কাজেই তিনি মাত্র চারটি অস্ত্রকে সম্বল করে এবং চারজন অসম সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে চৌহালী থানা আক্রমণের লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে অগ্রসর হন। চারজন দুঃসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্রলিং করে সেন্ট্রিশূন্য বাংকার অতিক্রম করে থানার মূল দালানের বারান্দায় পৌঁছে যান। সেখানে দেখতে পান অস্ত্র হাতে দু'জন সেন্ট্রি গভীর ঘুমে নিমগ্ন। এই অবস্থা দেখে ঘুমানো সেন্ট্রি দু'জনের মুখ চেপে ধরে সরিয়ে আনেন। বন্দী দুই সেন্ট্রির নিকট শুনেন, থানার ভেতরে সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এ বিবরণ শোনার পর পাক-হানাদার নিধনে অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেনের সরাসরি নেতৃত্বে বাতেন বাহিনীর দুঃসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিদ্রিত হানাদার কক্ষে প্রবেশ করেন। পাক-হানাদার বাহিনীর বিভোর ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা সেখান থেকে স্টোর রুমে প্রবেশ করে ১১টি জি থ্রি এবং ১২টি থ্রি নট থ্রি মার্কফোরসহ প্রচুর গোলাবারুদ দখল করে নেন। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ বিজয়ীর বেশে বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে ছিপ নৌকায় ফিরে আসেন। নৌকায় উঠার পর অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে নৌকা নিয়ে উজান বেয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁদের আশঙ্কা গুলির সন্ধানে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নাগাল পাওয়া যাবে কিনা? প্রায় মাইল খানেক এগিয়ে যাবার পর টর্চের সিগন্যাল দেয়া হয়।

সিগন্যাল পাবার দশ মিনিটের মধ্যেই বিশজন মুক্তিযোদ্ধা গুলির পেটিসহ নৌকায় এসে উপস্থিত হন। এর কয়েক মিনিট পরই চৌহালী থানা থেকে পাক-হানাদার সদস্যরা প্রচণ্ড বেগে গুলি বর্ষণ করতে শুরু করে। পাক-হানাদার সৈন্যদের একটি দল থানার বাইরে একটি গ্রামে নারী ধর্ষণ ও লুট করতে গিয়েছিল। ঘাতকদের এই দলটি থানায় এসেই গুলি বর্ষণ করতে শুরু করে। পাক-হানাদারদের গুলির ভেতর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা যমুনা নদী পাড়ি দেন। মাত্র চারটি রাইফেল নিয়ে চারজন মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে একটি থানা আক্রমণ শুধু আত্মঘাতিই নয়, এ অভিযান পাক হানাদার নিধনের উন্মাদের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। এ অভিযান ছিল যুদ্ধের সকল রীতিনীতি ও গেরিলাযুদ্ধের রণ কৌশল বহির্ভূত। এ এক অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব ঘটনা। অথচ চরম সত্য হলো চারটি জি-থ্রিসহ চারজন দুঃসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা চৌহালী থানা আক্রমণ করেন। শত্রুরা বিভোর ঘুমের মাঝে হতচকিত ভীতবিহ্বল। অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ চারজন বীর মুক্তিযোদ্ধার দখলে।

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর থানার ধল্লা ব্রিজ অভিযান ছিল বাতেন বাহিনীর একটি দুঃসাহসিক আক্রমণ। এ ব্রিজে পাহারার কাজে নিয়োজিত ছিল রাজাকার বাহিনীর ২০ জন সদস্য। তারা ব্রিজের দুপাশে ১০ জন করে অবস্থান করতো। এ মহাসড়ক দিয়ে প্রতিনিয়ত পাক-হানাদার বাহিনীর ট্রাক, জিপ ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুরসহ বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতো। ব্রিজের পাহারায় নিয়োজিত রাজাকাররা নিরীহ পথচারীদের ও আশে পাশের গ্রামে অত্যাচার, নির্যাতন করতো এবং তাদের সর্বস্ব লুট করতো। এ ধরণের অভিযোগ বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ মারফত জানার পর বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন ধল্লা ব্রিজ আক্রমণের পরিকল্পনা করে গোয়েন্দা বিভাগকে জরুরী ম্যাসেজ পাঠিয়ে অতি দ্রুততার সঙ্গে ব্রিজের আশপাশের খুঁটিনাটি বিবরণসহ বিস্তারিত তথ্যাবলী তাঁর নিকট পাঠানোর জন্য আদেশ প্রদান করেন। আদেশ পেয়ে গোয়েন্দা প্রদান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর বিভাগের অন্যতম চৌকস তথ্য কর্মকর্তা মো. শাজাহান গেন্তার নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা টিম পাঠিয়ে বাহিনী প্রধানের আদেশের ভিত্তিতে অতিদ্রুত রেকী করে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেনের নিকট প্রেরণ করেন। গোয়েন্দা বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে পেয়ে খন্দকার আবদুল বাতেন একটি ছিপ নৌকায় ২৫ জন সহযোদ্ধা সাথে নিয়ে ধল্লা ব্রিজের নিকটেই একটি পাট ক্ষেতে অবস্থান নেন। নৌকায় ৫ জন রেখে বাকী ২০ জনকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিজের দিকে অগ্রসর হন আবদুল বাতেন। ২০ জনের সবাই ছিল শর্ট আর্মসে সুসজ্জিত। বীর মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে হাজী সাহেবদের পোশাক পরেন। ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছানোর একটু আগেই হানাদার দুটি



ট্রাক টাঙ্গাইলের দিকে চলে যায়। পরিকল্পনা অনুসারে অধিনায়কের নেতৃত্বে ১০ জনের একটি দল অগ্রগামী হয়ে যায়। ১০ জন পেছন থেকে অনুসরণ করে অপর ১০ জনের দলটি। অগ্রগামী ১০ জন ব্রিজের দক্ষিণ পাশের প্রান্ত সীমায় অবস্থানরত ১০ জন রাজাকারকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয় এবং হাত মুখ বেঁধে ফেলে। পেছনে অনুসরণকারী দলের ১০ জন ব্রিজের উত্তর পাশের রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের বন্দী করে। ৫ মিনিটের মধ্যে ২০ জন রাজাকার বন্দী করে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা ছিপ নৌকা নিয়ে এসে তৃরিত গতিতে স্থান ত্যাগ করে। কিছু দূর সরে যাবার পর ব্রিজের নিকট থেকে প্রচণ্ড বেগে গুলি বর্ষণ করতে থাকে পাক-হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা। সম্ভবত ব্রিজের কাছের কোনো লোকের পাঠানো সংবাদ পেয়ে ঢাকা অথবা টাঙ্গাইল থেকে এসে হানাদার সৈন্যরা গুলি বর্ষণ করে। অনেক দূর যাবার পর বন্দী রাজাকারদের জবানবন্দী নেয়া হয়। স্বাধীনতাকামী মুক্তি সেনাদের এবং বাঙালি জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই রাজাকারগণ আর কোনো ভূমিকা গ্রহণ করবে না, এই প্রতিশ্রুতিতে ওদের মুক্তি দেয়া হয়। অবশ্য এর সাথে কিছু উত্তম মধ্যমও যোগ হয়। অশিক্ষিত অধম বাঙালির সন্তানরা সামান্য টাকার লোভে রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করে। তাদের স্ত্রী পুত্রসহ পরিবার আছে, এই মানবিক চিন্তাই তাদের মুক্তির কারণ।

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে হানাদারদের অবিরাম উপস্থিতি, ধল্লা ব্রিজের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা ভেবে ব্রিজ আক্রমণ ছিল অত্যন্ত কঠিন অভিযান।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে মানিকগঞ্জ জেলার জাব্রা ব্রিজের নিকট হানাদারদের গানবোট ধ্বংস করা ছিল বাতেন বাহিনীর কৃতিত্বপূর্ণ আক্রমণ। গোলাবারুদের অভাবে বাহিনীর ৬২টি চাইনিজ রাইফেল এবং ১৫টি এল এম জি প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। সে সময়ে বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন জানতে পারেন যে, মানিকগঞ্জের জাব্রা ব্রিজের উত্তরে একটি গ্রামে ১৭ পেটি চাইনিজ গুলি আছে। সেই গুলির সন্ধান এবং উদ্ধার করার লক্ষ্যে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধাসহ ঐ এলাকার দিকে অগ্রসর হন। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে সুবেদার আলমগীর ও নায়েক আবদুস সামাদ। বহু কষ্টে, বহু আঁকাবাঁকা পথঘাট পাড়ি দিয়ে মানিকগঞ্জ জেলার সেই গ্রামে পৌঁছান বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা। সৌভাগ্যবশত ১৭ পেটি গুলিই সেখানে পাওয়া যায়। ফলে জীবন ফিরে পায় ৬২টি চাইনিজ রাইফেল এবং ১৫টি চাইনিজ এল এম জি। ওখানে আরো অতিরিক্ত পাওয়া যায় একশতটি তাজা গ্রেনেড। উক্ত গ্রেনেড, গোলাবারুদসহ বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্থান ত্যাগ করার প্রাক্কালে চারপাশ থেকে বিভিন্ন

গ্রামের লোকজন এসে ভিড় জমায়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংবাদ দেন যে, প্রতি সপ্তাহে একটি করে গানবোট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে উত্তর দিকে যায়। যাবার সময় গানবোটটি জাব্রা ব্রিজের ৩/৪ মাইল উত্তরে একটি নির্দিষ্ট হাটে থামায়। পাক-হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা গানবোট থেকে নেমে নদীর পশ্চিম তীরের বিভিন্ন গ্রামে আক্রমণ চালায়। তারা ঐ সমস্ত গ্রামে হত্যা, লুটপাট অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ করে। ইতোমধ্যে পাক-হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা ঐ এলাকা থেকে ১৫/২০ জন যুবতি মেয়েকে গানবোটে তুলে নিয়ে যায়। এহেন জঘন্য কর্মকাণ্ডের ফলে অত্র তল্লাটে স্বজন হারানোর করুণ আর্তনাদ ও যুবতি কন্যা অপহরণ জনিত ভয় ভীতিতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। স্থানীয় জনসাধারণ বাতেন বাহিনীর অধিনায়কের নিকট এহেন দুর্যোগময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে আকুল আবেদন জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন বিষয়টি সম্পর্কে সক্রিয় চিন্তা ভাবনা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত নেন।

আক্রমণ স্থলে পৌঁছে দেখা গেলো পালদের হাঁড়ি পাতিল তৈরি করার জন্য এঁটেল মাটির ঢিবি সারি সারি ভাবে সাজানো আছে। নদীটিও সে স্থানে সংকীর্ণ ছিল। বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন কোম্পানি কমান্ডারদ্বয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আক্রমণের কৌশল ঠিক করেন। মাটির ঢিবিগুলো নদীর ঘাট থেকে দুইশত গজ দূরে অবস্থিত ছিল। সেখানেই বাংকার করে পজিশন নেন বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা। প্রথমদিকে যেভাবে পজিশন নেয়া হয়, সেভাবে পাক-হানাদার বাহিনীর সৈন্যদের ঘায়েল করা কঠিন হবে ভেবে কোম্পানি কমান্ডারদ্বয় বাহিনী প্রধানের সঙ্গে পরামর্শ করে দুই কোম্পানি নদীর দুই তীরে পজিশন নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গাঢ় অন্ধকারে নৌকা যোগে নদীর পূর্ব তীরে সুবেদার আলমগীরের নেতৃত্বে এক কোম্পানি পাঠানো হয়। সিগন্যাল কর্মপদ্ধতি এবং শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হলে অথবা কোম্পানি একত্রিত হবে তার পয়েন্ট নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এরপর বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা পাক-হানাদার বাহিনীর সৈন্য আগমনের জন্য প্রতীক্ষারত থাকে। মধ্যরাতে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামবাসীর দেয়া খাদ্য খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন। রাত শেষ হয়ে দিন এলো কিন্তু পাক হানাদার বাহিনীর গানবোটের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। এ প্রেক্ষিতে বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাগণ উক্ত স্থান ত্যাগ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, তখন গ্রামবাসীরা আরো একরাত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। গ্রামবাসীরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সকল ওয়াক্তের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। রাত্রে আবার মুক্তিযোদ্ধারা যার যার পজিশনে চলে যান। রাত্রের খাবার গ্রামবাসীরাই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠিয়ে দেন। রাত দুটোর সময় একজন স্কাউট পাঁচ ব্যাটারী টর্চের আলোয়



সংকেত দেয় গানবোট আসছে। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, গানবোট আসছে জাব্রা ব্রিজের নিচ দিয়ে। স্বভাবত অপর পারে সিগন্যাল চলে যায় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য।

রাত তিনটার সময় গানবোট বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ৪/৫ শত গজ দূরে ঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঘাট থেকে মাত্র ৫০ গজ দূরে থাকতে গর্জে উঠে বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের মারণাস্ত্রগুলো। এর ফলে গানবোট থেকে পাকহানাদার সৈন্যরা প্রচণ্ড বেগে গুলি বর্ষণ করতে শুরু করে বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপর। প্রথম দিকে বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি বর্ষণে গানবোটের কোনো প্রকার ক্ষতি না হওয়াতে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন বাধ্য হয়ে গুলি ছোঁড়ার কৌশল পরিবর্তন করেন। গানবোটের ফোকাস হোলে এবং চেইনে গুলি বর্ষণের নির্দেশ দেন। অধিনায়কের নির্দেশ অনুসারে তাঁর বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা গুলি বর্ষণ শুরু করেন। এবার কাজ হলো, গুলিতে গানবোটের হালের চেইন ছিড়ে যায়। গানবোটটি নদীর পূর্ব পার্শ্বের দিকে যেতে থাকে। স্রোতের টানে গানবোটটি একটু ভাটির দিকে চলে যায়। তার পরক্ষণেই ওপারে অবস্থানরত কোম্পানি গুলি ছুঁড়তে থাকে। রাত চারটার সময় স্কাউটের সংকেত পাওয়া যায়, হানাদারদের গানবোট জাব্রা ব্রিজের পাশ দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড গুলির আঘাতে গানবোটটি আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর গানবোটটি নদীর এক কিনারায় পড়ে যায়। এই আক্রমণে গানবোটের প্রচুর ক্ষতি হয়। পাক-হানাদারদের ৩৮ জন নিহত হয় এবং পাঁচজন মারাত্মক ভাবে আহত হয়।

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার খাসকাউলিয়া গ্রামে রাজাকার নিধন অভিযান বাতেন বাহিনীর একটি দুঃসাহসিক অভিযান ছিল। এই অভিযানটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুন পরিচালিত হয়। বাতেন বাহিনীর অন্যতম কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবদুল বারী ঐ অভিযানটি পরিচালনা করেন। তাঁর দূরদর্শিতার কারণে অভিযানটি সফলভাবে পরিচালিত হয়। এদিন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দেন। খাস কাউলিয়া ছিল রাজাকার বাহিনীর অন্যতম প্রভাবশালী নেতা অধ্যাপক আবদুল খালেকের এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল। তার মাধ্যমে হত্যা, লুটপাট ও নারী ধর্ষণের ফলে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। ঘাতক দালালের এহেন জঘন্য কার্যকলাপের সংবাদ বাতেন বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ মারফত অবহিত হবার পর বাতেন বাহিনী অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবদুল বারীকে অত্র তল্লাটের রাজাকার দমনের নির্দেশ প্রদান করেন। বাহিনী প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী সুবেদার আবদুল বারী অভিযান পরিচালনার জন্য এক অভিনব গেরিলা রণ কৌশল

উদ্ভাবন করেন। রণ কৌশল অনুযায়ী ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুন সোমবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কারণ ঐ দিন জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শুনে রাজাকারদের পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য এক সভা ডাকা হয় খাস কাউলিয়া মাদ্রাসা ও স্কুল প্রাঙ্গণে। রাজাকারদের আলোচনা সভার সংবাদ বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ মারফত পেয়ে, অনেককে একত্রে পাবার জন্য সুবেদার আবদুল বারী অভিযান পরিচালনার জন্য ঐ দিনই ধার্য করেন।

গেরিলা যুদ্ধের অভিনব কৌশল হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণকারী দল ছদ্মবেশে ভিক্ষুক সেজে দল বেঁধে রাজাকারদের আয়োজিত সভায় শর্ট আর্মসে সুসজ্জিত হয়ে সুবেদার আবদুল বারীর নেতৃত্বে প্রবেশ করেন। এক পর্যায়ে উক্ত দলের কমান্ডার সুবেদার আবদুল বারী একটি ফাঁকা গুলি ছুঁড়েন। এই ফাঁকা গুলির শব্দে সাধারণ জনগণ ভীত হয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে যায়। লোকজন পালিয়ে যাবার পর, সুবেদার আবদুল বারী রাজাকারদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। নির্দেশ মাফিক রাজাকাররা হাত উঁচু করে আত্মসমর্পণ করে। ওদেরকে বন্দী করে অন্যত্র গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং জবানবন্দী নেয়া হয়। রাজাকাররা ওয়াদা করে যে, ওরা আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে কোনো কাজ করবে না। এই শর্তে রাজাকারদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। যাকে কেন্দ্র করে অত্র এলাকায় স্বাধীনতা বিরোধী কার্যক্রম পরিচালিত হতো, হানাদারদের সেই সহচর পালিয়ে যাবার সময় মুক্তিবাহিনীর গুলিতে মারা যায়। এরপর ঐ এলাকায় রাজাকার ও শান্তি কমিটির কোনো প্রকার তৎপরতা ছিল না।

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাতেন বাহিনীর মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানা আক্রমণ ও দখল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় অভিযান। সাটুরিয়া থানায় বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা দু'বার অভিযান পরিচালনা করে। দু'বারই হানাদার পাক- সেনাদের থানা থেকে বিতাড়িত করে। ১৪ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানা আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগকে জরুরী ভিত্তিতে ম্যাসেজ পাঠান। বাহিনী প্রধানের জরুরী ম্যাসেজ পেয়ে, গোয়েন্দা প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর বিভাগের দু'জন বিশিষ্ট চৌকস তথ্য কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন নয়ন (আমি) এবং মোহাম্মদ শাজাহান গেন্তার নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা টিম পাঠিয়ে সাটুরিয়া থানার অভ্যন্তরীণ অবস্থা, অভ্যন্তরে ঢোকার রাস্তা, হানাদার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ, বাংকারের সংখ্যা, পজিশন নেয়ার স্থান নির্ধারণ, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অত্র এলাকার জনমত নিরীক্ষণ, আশেপাশে রাজাকারদের বাড়ি আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান (রেকী) পূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে তা বাহিনী প্রধানের



নিকট প্রেরণ করেন। বাহিনীর অধিনায়ক গোয়েন্দা বিভাগের দেয়া পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি হাতে পেয়ে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কমান্ডারদের সভা ডাকেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার পর বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানা আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৪ আগস্ট ছিল পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেনের জেদ জাগে যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে সাটুরিয়া থানা দখল করে সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে হবে। সেই লক্ষ্যে খন্দকার আবদুল বাতেন ১২ আগস্ট ১৯৭১, কোম্পানি নম্বর-৭, কোম্পানি নম্বর-১১, কোম্পানি নম্বর-১৭ এই তিন কোম্পানি সঙ্গে নিয়ে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার পাকুটিয়া ইউনিয়নে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিন কোম্পানির দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তিন দুঃসাহসী কোম্পানি কমান্ডারের উপর। কাবারিং কোম্পানির দায়িত্ব দেয়া হয় মীর কায়সারকে। ১৩ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে রাত দশটায় উক্ত তিন কোম্পানির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন সাটুরিয়া থানা অভিযানে অগ্রসর হন। প্রবল ঝড় বৃষ্টি, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে নৌকা যোগে খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর বাহিনী নিয়ে সাটুরিয়া থানার উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম কোম্পানির সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধিনায়ক স্বয়ং। থানার কাছাকাছি পৌঁছে বাতেন বাহিনীর দূরদর্শী বীর মুক্তিযোদ্ধারা পরিকল্পনা মাফিক পজিশন গ্রহণ করেন। ঝড় বৃষ্টির সেই অন্ধকার রাতে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক তাঁর হাতের চাইনিজ স্টেনগান দিয়ে গুলি ছুঁড়ে আক্রমণের সূচনা করেন। অধিনায়কের গুলির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধরত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র থেকে একযোগে প্রচণ্ড বেগে গুলি বর্ষণ হতে থাকে। থানায় অবস্থানরত পাক হানাদার বাহিনীর সৈন্যরাও প্রচণ্ড বেগে গুলি ছুঁড়তে থাকে।

এক পর্যায়ে থানার পশ্চিম পার্শ্বের ২টি বাংকার বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে। বাংকারে অবস্থানরত ৫ জন পাক-হানাদার সৈন্য মৃত্যু বরণ করে এবং অবশিষ্ট সৈন্যরা ভেতরের দিকে পালিয়ে যায়। এরপর শুরু হয় আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়। বাংকার থেকে ভেতরের দিকে গুলিবর্ষণ শুরু করে বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা। দ্বিতীয় বাংকারে পজিশন গ্রহণ করেন অধিনায়ক নিজেই এবং কোম্পানি কমান্ডার নায়েক আবদুস সামাদ। অধিনায়ক মাথা উচু করে ভেতরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে হানাদারদের গুলি এসে তাঁর মাথার ক্যাপ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়। মাথা নিচু করে ক্যাপ খুলে অধিনায়ক দেখেন তাঁর মাথার

ক্যাপের আগে পিছে ছিদ্র হয়ে গেছে। অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন কোম্পানি কমান্ডারকে বলেন, কোথা থেকে গুলি আসে তা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। পর্যবেক্ষণ করে কোম্পানি কমান্ডার বলেন, বালির বস্তার আড়ালে রয়েছে হানাদার সৈন্য। অধিনায়ক বলেন, "টুপিটা হাতে নিয়ে এমন ভাবে উঁচু করবো, যাতে শত্রুরা মনে করে এটাই আমার মাথা। আর গুলি করলে টুপিটা নিচে নামিয়ে ফেলবো। অমনি আপনি টার্গেট করে গুলি করবেন, ওদের হত্যা করতেই হবে।" পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিনায়ক টুপি শো করতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপসহ হাত নামিয়ে ফেলেন। গুলির উৎস মুখে গুলি চালায় কোম্পানি কমান্ডার নায়েক আবদুস সামাদ। তার পরক্ষণেই ইয়া আলী বলে চিৎকার করে বালির বস্তার ওপর দিয়ে এসে ধপ করে পড়ে যায় এক দশাসই পাক-হানাদার সৈন্য। এই কাজের পুরস্কার হিসেবে অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর ছিদ্র টুপিটা কোম্পানি কমান্ডার নায়েক আবদুস সামাদের মাথায় পরিয়ে দেন এবং তার পিঠ চাপড়িয়ে সাব্বাস বলেন। সেই সাথে কোম্পানি কমান্ডারের নিকট প্রথম কোম্পানির দায়িত্ব অর্পণ করেন বাহিনীর অধিনায়ক।

এরপর শাহজানী চরের সাহসী বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. ছিদ্দিক বিএসসিকে সঙ্গে নিয়ে অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন পাট পচা পানির ডোবা সাতরিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। অস্ত্রসহ ক্রুলিং করতে করতে দুজনেরই হাতের চামড়া ছুঁলে যায়। সেই অবস্থায় থানার দক্ষিণ দিকের প্রবহমান খালের ধারে দুজনেই উপস্থিত হন। সেখানে নিরাপদ স্থান থেকে লক্ষ্য করেন খালের পূর্ব পারের কাবারিং কোম্পানি সঠিক দায়িত্ব পালন করছে না। সে টার্গেটে গুলি করার কথা তা হচ্ছে না। দু'জনে খাল সাঁতরিয়ে পূর্ব পারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাক-হানাদারদের প্রচণ্ড গুলির মধ্য দিয়ে জীবনকে বাজি রেখে দু' জনেই সাঁতরিয়ে খালের পূর্ব পাড়ে উপস্থিত হন। বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন এবার কাবারিং কোম্পানিকে নির্দেশ দেন থানার দালানের জানালার ভেতর লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে। নির্দেশ মাফিক কাবারিং কোম্পানি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে, এতে কাজ হয়। কিছুক্ষণ পর থানায় অবস্থানরত পাক-হানাদার সৈন্যরা লাঠির মাথায় সাদা কাপড় বেঁধে আত্মসমর্পণের সিগন্যাল দেয়। সেই সিগন্যাল পেয়েও কাবারিং কোম্পানিকে নির্দেশ দেন গুলি বর্ষণ অব্যাহত রাখতে। অধিনায়ক মাত্র ১৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে খাল সাঁতরিয়ে পশ্চিম পারে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। পশ্চিম পারে উপস্থিত হয়ে সেখানে রাখা গোল কাঠের স্তুপের আড়ালে আশ্রয় নেন বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা। সেই গোল কাঠের স্তুরের আড়াল থেকে অধিনায়ক কাবারিং কোম্পানিকে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পর আবার পাক-হানাদার সৈন্যরা সাদা জামা লাঠিতে তোলে আত্মসমর্পণের সিগন্যাল দেয়। মোহাম্মদ ছিদ্দিক হোসেন



বিএসসি'র সঙ্গে পরামর্শ করে অধিনায়ক ১৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত গতিতে পৌঁছে যান হানাদারদের পাকা দালানে। পাক-হানাদার সৈন্যের একাদশসই মিলিশিয়ার সামনে পড়ে যান অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন। পাক-হানাদার সেনা তার হাতের চাইনিজ রাইফেল দিয়ে অধিনায়কের বুক বরাবর গুলি করে। ট্রিগার টিপার সঙ্গে সঙ্গে অধিনায়ক তাঁর হাতের স্টেনগান দিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করেন। শত্রুর রাইফেলের গুলি অধিনায়কের বগলের তল দিয়ে বের হয়ে যায়। তারপরই অধিনায়কের চাইনিজ স্টেনগানের গুলিতে হানাদার সৈন্যের মৃত্যু ঘটে। তার পরের ইতিহাস শত্রু নিধনের ইতিহাস। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে সাটুরিয়া থানা দখল করে সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন। সাটুরিয়ার সর্বস্তরের মানুষ বাতেন বাহিনীকে অভিনন্দন জানান। বিপন্ন নিরস্ত্র মানুষের খাদ্যের প্রয়োজনে বাতেন বাহিনী সাটুরিয়ার খাদ্য গুদাম খুলে দেয়। হাজার হাজার জনতা খাদ্য শস্য তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। বেলা দুইটার সময় বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা সাটুরিয়া থানা ত্যাগ করে বিজয়ী বেশে লাউহাটীর দিকে অগ্রসর হয়।

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাতেন বাহিনীর কৃতিত্বপূর্ণ অভিযানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল মানিকগঞ্জ জেলার (সাবেক ঢাকা জেলা) হরিরামপুর থানা আক্রমণ ও দখল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের ২০ তারিখের দিকে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানা আক্রমণের পরিকল্পনা করে তা তাঁর বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগকে অবহিত করেন। গোয়েন্দা প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকার মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানা আক্রমণের ব্যাপারে বাহিনী প্রধানের বার্তা পেয়ে, তাঁর বিভাগের অন্যতম চৌকস তথ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাজাহান গেন্তার নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা টিম সরেজমিনে পাঠিয়ে হরিরামপুর থানার অভ্যন্তরীণ অবস্থা, বাহিরের অবস্থা, অভ্যন্তরে ঢোকার রাস্তা, হানাদার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ, বাংকারের সংখ্যা, পজিশন নেয়ার স্থান নির্ধারণ, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অত্র তল্লাটের জনগণের মনোভাব, আশেপাশে কোনো রাজাকার, জামায়াত ইসলামি, মুসলিম লীগারের বাড়ি আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান (রেকী) পূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে তা বাহিনী প্রধান এবং হরিরামপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেনের সমীপে প্রেরণ করেন। বাতেন বাহিনী প্রধান এবং হরিরামপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন গোয়েন্দা বিভাগের দেয়া পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি হাতে পেয়ে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই বাছাই এবং চুলচেরা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কমান্ডারদের সভা আহ্বান করেন। সভায় গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রসঙ্গ

নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা পর্যালোচনা হওয়ার পর বাহিনী প্রধান অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানা আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ জুন ১৯৭১ মানিকগঞ্জ জেলার (প্রাক্তন ঢাকা জেলা) হরিরামপুর থানা আক্রমণের লক্ষ্য নিয়ে বাতেন বাহিনী প্রধান, হরিরামপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন নৌকাযোগে তাঁর বাহিনী নিয়ে হরিরামপুর প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুবেদার মেজর একেএম আবু তাহের, সুবেদার আবদুল বারী, আবুল কালাম আজাদ শাজাহান, মো. ছিদ্দিক হোসেন বিএসসি, মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, মো. বেল্লাল হোসেন দেওয়ান, মো. জাহাঙ্গীর আলম খান, মো. আবদুল কুদ্দুস, আবদুর রশীদ, নায়েক আবদুস সামাদ, নায়েক হুমায়ুন, নায়েক আজহার, নায়েক আলাউদ্দিন, নায়েক সিরাজুল হক, নায়েক মীর কায়সারসহ আরও অনেকে। বর্ষাকাল, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, গাঢ় অন্ধকার, রাত ২ টার সময় বাতেন বাহিনীর অধিনায়কের নেতৃত্বে বাতেন বাহিনীর অকুতোভয় দুঃসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা হরিরামপুর থানা আক্রমণ করে। হানাদার বাহিনীর মিলিশিয়া ও পুলিশ বাহিনীর লোকজনরা হরিরামপুর থানার প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের তিন ভাগে ভাগ করে, প্রথম ভাগের নেতৃত্ব নেন বাহিনী প্রধান ও হরিরামপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন স্বয়ং, দ্বিতীয় ভাগের নেতৃত্ব দেয়া হয় সুবেদার মেজর এ কে এম আবু তাহেরকে, আর তৃতীয় ভাগের নেতৃত্ব দেয়া হয় সুবেদার আবদুল বারীকে। গেরিলা যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী শত্রু সৈন্যদের পালিয়ে যাবার পথ রেখে, থানার তিন দিক থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। বাহিনী প্রধান এবং উক্ত আক্রমণের অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন প্রথম গুলি ছুঁড়ে আক্রমণ করার সংকেত দেয়ার সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি চালাতে থাকে। তবে গোলাবারুদের স্বল্পতার কারণে বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে ১৫ মিনিট একনাগাড়ে গুলি করার পর ৫ মিনিট বিরতি দিতে হবে। পুনরায় নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই ভাবে চলতে থাকবে। অধিনায়কের নির্দেশ অনুযায়ী তিন ঘণ্টা ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ হবার পর পাক-হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং নিরুপায় হয়ে হানাদার বাহিনীর সেনা, মিলিশিয়া, পুলিশ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানা সাময়িক বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে। বাতেন বাহিনী প্রধান, হরিরামপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক এবং থানা দখলের অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর বাহিনী নিয়ে হরিরামপুর থানায় গিয়ে উঠেন। ধীরে ধীরে আশ-পাশের জনগণও আসতে



থাকে। তাদের সাথে খন্দকার বাতেনের কুশল বিনিময় হয়। মুক্তিযোদ্ধা জনতাকে সাথে নিয়ে বাতেন বাহিনী প্রধান এবং হরিরামপুর থানা আক্রমণ ও দখলের অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন থানার উপকণ্ঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলন করার সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র জনতা জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু গগণবিদারী শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা সকাল ৯টার দিকে হানাদার বাহিনীর রেখে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বারুদসহ হরিরামপুর থানা ত্যাগ করে চলে আসে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা কৌশল হিসেবে শত্রুকে আঘাত করে সরে পরা।

**২৮ জুন ১৯৭১ মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানা আক্রমণ ও দখল :** একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাতেন বাহিনীর কৃতিত্বপূর্ণ অভিযানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানা আক্রমণ ও দখল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের শেষ দিকে এসে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন মানিকগঞ্জ জেলার (প্রাক্তন ঢাকা জেলা) শিবালয় থানা আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা তাঁর বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগকে অবহিত করেন। মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানা আক্রমণের ব্যাপারে বাহিনী প্রধানের বার্তা পেয়ে গোয়েন্দা প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের চৌকস তথ্য কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন নয়নের নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা টিম পাঠিয়ে শিবালয় থানার অভ্যন্তরীণ অবস্থান, অভ্যন্তরে ঢোকার রাস্তা, থানার বাহিরের অবস্থা, হানাদার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ, বাংকারের সংখ্যা, পজিশন নেয়ার স্থান নির্ধারণ, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অত্র তল্লাটের জনমত, অত্র এলাকায় রাজাকার, মুসলিম লীগার-জামায়াতি ইসলামিদের বাড়ি আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান (রেকী) পূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করে তা বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক এবং শিবালয় থানা আক্রমণের অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন এর সমীপে প্রেরণ করেন। বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন শিবালয় থানা আক্রমণের ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগের অনুসন্ধানী পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি হাতে পেয়ে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কমান্ডারদের সভা আহ্বান করেন। বাহিনী প্রধান ও শিবালয় থানা আক্রমণের অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেনের পৌরহিত্বে কোম্পানি কমান্ডারদের জরুরী সভায় গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার পর বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানা আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুন মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন, খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর নেতৃত্বে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাতেন বাহিনী নিয়ে মানিকগঞ্জ জেলার (প্রাক্তন ঢাকা জেলা)

শিবালয় থানা আক্রমণ করেন। উক্ত আক্রমণটি বাতেন বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধ ছিল। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিবালয় থানা আক্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাহিনী প্রধান ও শিবালয় থানা আক্রমণের অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন নৌকাযোগে তাঁর বাহিনী নিয়ে শিবালয় প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুবেদার আবদুল বারী, আবুল কালাম আজাদ শাজাহান, মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, আবদুর রশীদ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আফতাব হোসেন আরজু, মো. ফজলুল হক মল্লিক, মো. হুরমুজ আলী বিএসসি, নায়েক আবদুস সামাদ, নায়েক আজহার, নায়েক হুমায়ূন, নায়েক আলাউদ্দিন, নায়েক সিরাজুল হক, ইপিআর বাহিনীর সদস্য বাবুল চৌধুরীসহ আরও অনেকে। বর্ষাকাল, থানার চতুর্দিকে থৈ থৈ পানি, ঝড় বৃষ্টির সেই দুর্যোগময় ঘুটঘুটে গাঢ় অন্ধকার রাতে ঠিক ১২টার সময় শিবালয় থানায় অবস্থানরত হানাদার বাহিনীর ওপর আক্রমণের সূত্রপাত করা হয়। খন্দকার আবদুল বাতেন ও সুবেদার আবদুল বারীর যৌথ নেতৃত্বে বাতেন বাহিনীর দু'টো দল শিবালয় থানা আক্রমণ করে। বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর হাতে চাইনিজ স্টেনগান দিয়ে গুলি ছুড়ে আক্রমণের সূচনা করেন। অধিনায়কের গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতেন বাহিনীর ঐ অভিযানে উপস্থিত সকল মুক্তিযোদ্ধা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি বর্ষণ হতে থাকে। বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধা দ্বিমুখী আক্রমণের চাপে পাক-হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা ও তাদের সহযোগী মিলিশিয়া, পুলিশ সদস্যরা দিশেহারা হয়ে পরে। শিবালয় থানায় বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাক-হানাদার বাহিনীর তিন ঘণ্টা ব্যাপী এক প্রচণ্ড মরণপণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এহেন মরণপণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাক-হানাদার বাহিনীর প্রচুর জীবনহানি ঘটে। মরণপণ যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাক-হানাদার বাহিনী তাদের সহযোগী মিলিশিয়া পুলিশসহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পাক-হানাদার বাহিনী তাদের সহযোগীসহ পালিয়ে বাঁচবার পর শিবালয় থানা সাময়িক বাতেন বাহিনীর দখলে চলে আসে। দখলে চলে আসার পর সেখান থেকে বাতেন বাহিনী প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে। এই যুদ্ধে বাতেন বাহিনীর তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। শিবালয় থানা পতনের পর ভোর ৬টার দিকে দুটি সাবর জেট জঙ্গী বিমান থানা আক্রমণকারী বাতেন বাহিনীর ওপর দিয়ে উড়ে যায়। প্রথম বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা মনে করেন বিমান দুটি আর হয়তো ফিরে আসবে না। কিন্তু দেখা গেল, বিমান দুটি উপর দিয়ে বার বার ড্রাইভ করা শুরু করলো। বিমান দুটোর বার বার উড়া দেখে সুবেদার আবদুল বারী বিমান দুটিকে গুলি করার জন্য বাহিনীর অধিনায়কের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেনের অনুমতি পেয়ে সুবেদার আবদুল বারী ও নায়েক আজহার



দুটি জি থ্রি দিয়ে দুজনে বিমান দুটিকে গুলি করেন। জি থ্রি গুলির মুখে বিমান দুটি অতি দ্রুত স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

শিবালয় থানা আক্রমণ করে সফলতা অর্জন করায় বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় কুখ্যাত পাক-হানাদার নিধনে। ইতোমধ্যে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা শিবালয় থানা দখলের খবর পেয়ে চতুর্দিক থেকে হাজার হাজার জনতা থানা প্রাঙ্গনে এসে ভিড় জমায়। উক্ত যুদ্ধের অধিনায়ক বাতেন বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন আগত জনতার সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। এরপর মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রজনতাকে সাথে নিয়ে খন্দকার আবদুল বাতেন শিবালয় থানা প্রাঙ্গনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলনের পর অত্র এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করতে চাইলে বাহিনী প্রধান বলেন, "আপনাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, খাবার ব্যবস্থা করার আগ্রহে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, তবে মুক্তিযুদ্ধের নিয়মানুযায়ী এখানে আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না, আপনারাও থানা এলাকা ছেড়ে দূরে চলে যান।" বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা সকাল ৮টার মধ্যে পাক হানাদার বাহিনীর রেখে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদসহ শিবালয় থানা ত্যাগ করে চলে আসে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা পদ্ধতি হলো শত্রুকে আঘাত করে সরে পরা।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানা প্রথম বার অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে আক্রমণ, দখল, থানার উপকণ্ঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বাতেন বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তম প্রয়োজনে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের লক্ষ্যে ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন ভারতে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুক্তিবাহিনী 'বাতেন বাহিনী' সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মো. আবুল কালাম আজাদ শাজাহান, মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, আবদুল রশীদ– এই তিন সদস্যের পরিচালনা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে মো. আবুল কালাম আজাদ শাজাহানকে 'বাতেন বাহিনী'র অস্থায়ী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে যান।

দ্বিতীয়বার সাটুরিয়া থানা আক্রমণ ও দখল: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে মুক্তিযুদ্ধকালীন, বাতেন বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন তখন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতায় অবস্থান করছিলেন। বাতেন বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন মো. আবুল কালাম আজাদ শাজাহান। উক্ত সময় বাতেন বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে অবস্থান করতেন বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান মো. আবুল কালাম

আজাদ শাজাহান, ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর এ কে এম আবু তাহের, বেসরকারি প্রধান মো. আলী আকবর খান ডলার, গোয়েন্দা বিভাগের দুই কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন নয়ন এবং মো. শাজাহান গেন্তা, কোয়ার্টার মাস্টার খন্দকার আবদুল করিম চাতক, কোষাধ্যক্ষ আবদুল লতিফ প্রমুখ। বাতেন বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে অবস্থানরত বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ একটি জরুরী সভায় মিলিত হয়ে মানিকগঞ্জ জেলার (সাবেক ঢাকা জেলা) সাটুরিয়া থানা পুনরায় (দ্বিতীয়বার) আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এতে আক্রমণ পরিচালনার মূল দায়িত্ব দেয়া হয় বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর এ কে এম আবু তাহেরকে। বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর এ.কে.এম আবু তাহের থানা আক্রমণের বিষয়টি অনুসন্ধান (রেকী) করে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করার জন্য বাতেন বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধানকে আনুষ্ঠানিক বার্তা পাঠান। বাতেন বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকার বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার এবং সাটুরিয়া থানা আক্রমণের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ.কে.এম আবু তাহেরের আনুষ্ঠানিক বার্তা পেয়ে তাৎক্ষণিক তাঁর বিভাগের দু'জন চৌকস তথ্য কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন নয়ন এবং মো. শাজাহান গেন্তার যৌথ নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা টিম পাঠিয়ে সাটুরিয়া থানার অভ্যন্তরীণ অবস্থান, অভ্যন্তরে ঢোকার রাস্তা, থানার বাহ্যিক অবস্থা, পুলিশ-মিলিশিয়াসহ হানাদার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ, বাংকারের সংখ্যা- কোথায় কোনটির অবস্থান, পজিশন নেয়ার স্থান নির্ধারণ, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অত্র এলাকার জনমত জরিপ, অত্র তল্লাটে রাজাকার, জামায়াত ইসলামি, মুসলিমলীগার আছে কিনা, মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান (রেকী) পূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে তা বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার ও সাটুরিয়া থানা আক্রমণের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ কে এম আবু তাহের সমীপে প্রেরণ করেন। বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার এবং সাটুরিয়া থানা আক্রমণের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ কে এম আবু তাহের সাটুরিয়া থানা আক্রমণের ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগের অনুসন্ধানী (রেকী) পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি হাতে পেয়ে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কমান্ডারদের জরুরী সভা আহ্বান করেন। এ কে এম আবু তাহেরের পৌরহিত্বে কোম্পানি কমান্ডারদের সভায় বাহিনীর গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনার পর ২১ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দিবাগত রাতের শেষ দিকে অর্থাৎ ২২ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে রাত ৩টায় বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর এ কে এম আবু তাহের মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানা আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।



অভিযানের অধিনায়ক বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর এ কে এম আবু তাহের যুদ্ধের প্রাক প্রস্তুতির ব্যাপারে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাতেন বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার, সেকশন কমান্ডারসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় জরুরী নির্দেশনা দেন। তিনি উল্লেখ করেন, একটি দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয় গেরিলা পদ্ধতিতে কিন্তু গেরিলাযুদ্ধ যখন ধাপে ধাপে বিজয়ের দ্বার প্রান্তে এসে যায় তখন তা স্বাভাবিক গতিতে সম্মুখ সমরে পরিণত হয়ে যায়। এবারের সাটুরিয়া থানা আক্রমণ সম্মুখ যুদ্ধ হলেও আমাদের বাহিনীর গোলাবারুদের স্বল্পতার কারণে কিছু কিছু ব্যাপারে গেরিলা কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যুদ্ধের সাধারণ নিয়মানুযায়ী শত্রু পালিয়ে যাবার জন্য একদিক অর্থাৎ দক্ষিণ দিক খোলা রাখতে হবে ঢাকার দিকে পালিয়ে যাবার জন্য। আর সাটুরিয়া থানার তিন দিক থেকে অর্থাৎ পূর্ব, উত্তর এবং পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। সাটুরিয়া থানা আক্রমণের অধিনায়ক, বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর একে এম আবু তাহের বলেন, "ঠিক রাত তিনটায় আমি এক্সক্লোসিভ ফাটিয়ে যুদ্ধের সূচনা করবো। আপনারা কোম্পানি কমান্ডার, সেকশন কমান্ডারসহ বাতেন বাহিনীর সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা সূচনা সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে মাটিতে শুয়ে পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে গুলি বর্ষণ করতে থাকবেন। একনাগাড়ে পাঁচ মিনিটে গুলি বর্ষণের পর নীরবে আধা ঘণ্টা মাটিতে শুয়ে থাকবেন। আধা ঘণ্টা পাক-হানাদার বাহিনীর অনবরত গুলি বর্ষণের পর আবার পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে গুলি বর্ষণের পর আধা ঘণ্টা নীরবে মাটিতে শুয়ে থাকবেন। উক্ত নিয়মানুযায়ী চলতে থাকবে, আমার আদেশ পুনরায় না পাওয়া পর্যন্ত। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমার আদেশ অনুসরণ করবেন।"

এ ছাড়া বাতেন বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান মো. আবুল কালাম আজাদ শাজাহান, বাহিনীর বেসরকারি প্রধান মো. আলী আকবর ও মো. শাজাহান গেন্তা আলাদা ভাবে বৈঠকে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা পর্যালোচনা করে যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে যুদ্ধরত বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পেছন থেকে সার্বিক সহযোগিতা দেয়ার একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার, সাটুরিয়া থানা দ্বিতীয়বার আক্রমণের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ.কে.এম আবু তাহেরের নেতৃত্বে ও কোম্পানি কমান্ডারদের সমন্বয়ে এহেন বৃহৎ যুদ্ধে বাতেন বাহিনীর পাঁচশত সশস্ত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা মরণপণ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবে। তাদের জন্য সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জরুরী চিকিৎসার ব্যাপারে বাতেন বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সদের সাথে অতিরিক্ত ডাক্তার নার্সদের সংযুক্ত করে যুদ্ধ ক্ষেত্রের খুব কাছাকাছি সাথে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা আরও উপলব্ধি করছিলাম, এই অভিযানটি এমনি এক সময়ে বাতেন বাহিনীর

দুর্ধর্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাক-হানাদার বাহিনীর ওপর সর্বশক্তি দিয়ে চরম আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যখন বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বিজয়ের প্রায় দ্বার প্রান্তে উপনীত। তখন আমরা অনুমান করছিলাম যে, মানিকগঞ্জ জেলার (সাবেক ঢাকা জেলা) সাটুরিয়া থানার এই ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধটি জনযুদ্ধে রূপ নিতে পারে। জনগণ গগণবিদারী জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে জঙ্গী রূপ ধারণ করে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে ফেলে নিজেদের জীবনের ঝুঁকির কথা না ভেবে থানার দিকে অগ্রসর হতে পারে। এমত অবস্থায় জনগণের জীবন রক্ষার্থে আমাদের সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এহেন সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ, বিপদজনক পরিস্থিতি সুকৌশলে শক্ত হাতে মোকাবেলা করার লক্ষ্য নিয়ে সাটুরিয়া থানার সকল ইউনিয়নসহ আশেপাশের ইউনিয়নগুলোতে গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে একটি সাংগঠনিক শক্ত ভীত গড়ে তোলার মাধ্যমে সুসংগঠিতভাবে রণাঙ্গনে প্রস্তুত রাখার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

যথারীতি পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাটুরিয়া থানা তিন দিক (পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম) থেকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একদিক (দক্ষিণ) শত্রুসৈন্য পালিয়ে যাবার জন্য খোলা রাখা হয়। পূর্ব দিকের দায়িত্ব দেয়া হয় বাতেন বাহিনীর অন্যতম চৌকস কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবদুল বারীকে, উত্তর দিকের দায়িত্ব দেয়া হয় বাতেন বাহিনীর আর একজন দক্ষ কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মো. আলমগীরকে এবং পশ্চিম দিকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দূরদর্শী কোম্পানি কমান্ডার নায়েক আবদুস সামাদকে। এরপর বাতেন বাহিনীর সুদক্ষ ফিল্ড কমান্ডার সাটুরিয়ায় দ্বিতীয়বার ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ. কে. এম আবু তাহের মূল যুদ্ধের সামগ্রিক দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নির্ধারিত তারিখে ঠিক রাত তিনটার সময় এক্সপ্লোসিভ ব্রাস্ট করে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানা আক্রমণের সূচনা সংকেত ঘোষণা করেন। অধিনায়কের নির্দেশ মোতাবেক যুদ্ধের সূচনা সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যেকটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হতে গুলি বর্ষণ শুরু হলো। পাক হানাদার বাহিনীও প্রবলবেগে পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করলো। তুমুল বেগে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বাতেন বাহিনীর সুদক্ষ ফিল্ড কমান্ডার, দ্বিতীয়বার ঐতিহাসিক সাটুরিয়া যুদ্ধের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ.কে.এম আবু তাহেরের দক্ষ নেতৃত্বে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য পেছন থেকে আমরাও বাতেন বাহিনীর হেডকোয়ার্টারের পক্ষ থেকে পূর্ব-উত্তর-পশ্চিমে ভাগ হয়ে রাত তিনটা থেকেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি সহকারে দায়িত্বরত



ছিলাম। বাতেন বাহিনীর বেসরকারি প্রধান মো. আলী আকবর খান ডলার ওয়ার্শি, রাজাপুরসহ পূর্বাঞ্চলের লোকজন নিয়ে সাটুরিয়া থানার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থান নিয়েছিলেন, বাতেন বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান মো. আবুল কালাম আজাদ শাজাহান লাউহাটী, মোকনা এলাকার গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে সাটুরিয়া থানার উত্তর দিকে অবস্থান নিয়েছিলেন আর গোয়েন্দা বিভাগের দুজন মানুষ আমি ও মো. শাজাহান গেন্তা সাটুরিয়া থানার পশ্চিম পার্শ্বের ইউনিয়নগুলোসহ পাকুটিয়া ইউনিয়নের গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে থানার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থান নিয়েছিলাম। সেই সাথে বাতেন বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ হাসাপাতালের পরিচালক বেঙ্গল রেজিমেন্টের চিকিৎসক মো. জহুরুল ইসলাম ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সসহ, অতিরিক্ত ডাক্তার নার্সদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন। এ ছাড়া একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাতেন বাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অগ্নিশিখা'র সাংবাদিকবৃন্দও রাত্রি ৩টা থেকেই রণাঙ্গনে অবস্থান করে সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

রাতের একেবারে শেষ প্রহর, ফজরের নামাজের সুমধুর আজানের সুরধ্বনী মাইকের মাধ্যমে শুনা যাচ্ছিল, ফজরের নামাজের পর সূর্যের আলো যখন ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক দৃশ্যপট আলোকিত করে তুলছে, ঠিক তখন থেকেই সাটুরিয়া থানার চতুর্দিক থেকে হাজার হাজার ছাত্রজনতা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার টানে বলীয়ান হয়ে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় মুক্তিযোদ্ধা,

গগণবিদারী শ্লোগান দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে মরণপণ যুদ্ধে নিয়োজিত বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পেছন দিয়ে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সেই সাথে অনবরত জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকলো। রণাঙ্গনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশমাতৃকার টানে এগিয়ে আসা দেশপ্রেমিক ছাত্রজনতার সেই অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা, উন্মাদনা যারা সরাসরি অবলোকন করেননি, তাদের লেখার মাধ্যমে পুরোপুরি বুঝানো যাবে না। সকাল আটটার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সকালের নাস্তার ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো কিছু বলার আগেই অত্র তল্লাটের জনগণ নিজ দায়িত্বে ধামায় ধামায় মুড়ি, কাঠায় কাঠায় গুড় এনে উপস্থিত করলো। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের (যুদ্ধরত) পালাক্রমে নাস্তা করানো হলো। বাতেন বাহিনীর পাঁচশত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাসহ আরও যারা ছিলাম সবাই মিলে জনগণের দেয়া মুড়ি, গুড় খেয়ে শেষ করা গেল না। বেলা বাড়ার সাথে সাথে গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছাত্রজনতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক মিছিল জঙ্গী রূপে আবির্ভূত হতে থাকলো, পর্যায়ক্রমে হাজার হাজার ছাত্র জনতা জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় মুক্তিযোদ্ধা ইত্যাদি গগণবিদারী শ্লোগান দিয়ে

যুদ্ধরত বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে রেখে সাটুরিয়া থানায় অবস্থানরত পাক-হানাদার বাহিনীর উপর বাঁশের লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার লক্ষ্যে থানার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। বাতেন বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের মাধ্যমে ছাত্রজনতাকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যে সাংগঠনিক শক্ত ভীত গড়ে তোলা হয়েছিল তার সক্রিয় উদ্যোগে অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় অনেক কষ্টে এহেন উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

কুখ্যাত পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মরণপণ তুমুল লড়াইয়ের পটভূমিতে দুপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারের প্রসঙ্গটি আমাদের মনেই ছিল না। এমতাবস্থায় দুপুরের খাবারের সময়ের একটু আগেই অত্র এলাকার দেশপ্রেমিক সচেতন জনগণ স্বউদ্যোগে ধামায় ধামায় ভাত, ডিশে ডিশে ডাল, বাটিতে বাটিতে ভাজি ও তরকারি এনে হাজির করলো। ইতোমধ্যে খবর পাওয়া গেল, পাক-হানাদার বাহিনীর পুলিশ, মিলিশিয়াসহ সৈন্যরা মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানা ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকের খোলা রাখা পথ দিয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে গিয়েছে। হয়তো এটা ওদের দুরভিসন্ধিমূলকও হতে পারে। জঙ্গী জেট বিমানসহ আরও ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে এসে বাতেন বাহিনী নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার একটা পরিকল্পনাও করতে পারে। তাই বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে থানার দিকে অগ্রসর না হয়ে একটু দূরে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে নেয়। জনগণের দেয়া দুপুরের খাবারও মুক্তিযোদ্ধারা খেয়ে শেষ করতে পারে না। এই ঐতিহাসিক সাটুরিয়া যুদ্ধে বাতেন বাহিনীর একজন দুর্ধর্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জিয়ারত আলী শহিদ হন। পাকসেনাদের হতাহতের কথা আমরা জানতে পারিনি। এক পর্যায়ে বাতেন বাহিনীর বেসরকারি প্রধান মো. আলী আকবর খান ডলারের নেতৃত্বে বাতেন বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন স্বেচ্ছাসেবকসহ অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্রজনতার উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। দুপুরের খাবারের পর যুদ্ধের গেরিলা কৌশল হিসেবে দুপুরের খাবারের পর সাটুরিয়া যুদ্ধে অংশ নেয়া বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা উত্তর দিকে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসে। রাতেই ঐতিহাসিক সাটুরিয়া যুদ্ধে নিহত বাতেন বাহিনীর অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ জিয়ারতের লাশ তাঁর নিজ গ্রামে নিয়ে আমাদের সবার উপস্থিতিতে জানাজার নামাজের পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর এ.কে.এম আবু তাহেরের নেতৃত্বে গার্ড অব অনারের মাধ্যমে দাফন করা হয়।

**নাগরপুর থানা আক্রমণ ও দখল : ১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে, সম্ভবত **২১** তারিখে বাতেন বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে টাঙ্গাইল



জেলার নাগরপুর থানা আক্রমণের পরিকল্পনা করে উক্ত আক্রমণের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেয়া হয় বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর এ.কে.এম. আবু তাহেরকে। বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর এ.কে.এম আবু তাহের টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানা আক্রমণের অধিনায়কের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে থানা আক্রমণের বিষয়টি অনুসন্ধান (রেকী) করে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করার জন্য বাতেন বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিক বার্তা পাঠান। বাতেন বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকার বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার এবং নাগরপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ. কে. এম. আবু তাহেরের আনুষ্ঠানিক বার্তা পেয়ে, তাৎক্ষণিক তাঁর বিভাগের দু'জন চৌকস গোয়েন্দা কর্মকর্তা মো. শাজাহান গেন্তা ও মুলতান উদ্দিনের যৌথ নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা টিম পাঠিয়ে, নাগরপুর থানার অভ্যন্তরীণ অবস্থান, থানার অভ্যন্তরে ঢোকার রাস্তা, থানার বাহ্যিক অবস্থা, পুলিশ মিলিশিয়াসহ হানাদার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ, বাংকারের সংখ্যা কোথায় কোনটির অবস্থান, পজিশন নেয়ার স্থান নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান (রেকী) পূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে তা বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার, নাগরপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ. কে. এম আবু তাহের সমীপে প্রেরণ করেন। নাগরপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর এ. কে. এম. আবু তাহের বাতেন বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ সরকারের পাঠানো পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানী রিপোর্টটি হাতে পেয়ে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে বাতেন বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডারদের জরুরী সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় পৌরহিত্ব করেন বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার নাগরপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ. কে. এম. আবু তাহের। সভায় গোয়েন্দা বিভাগের দেয়া পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানী রিপোর্টটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনার পর ২৫ নভেম্বর **১৯৭১** নাগরপুর থানা আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

**১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার এবং নাগরপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ. কে. এম. আবু তাহেরের নেতৃত্বে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানা আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। উক্ত অভিযানটিও বাতেন বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধ। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাগরপুর থানা আক্রমনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার, নাগরপুর থানা আক্রমনের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ. কে. এম আবু তাহের লাউহাটী থেকে নৌকা যোগে খরস্রোতা ধলেশ্বরী নদী পাড়ি দিয়ে এই যুদ্ধে অংশ নেয়া

বাহিনী নিয়ে নাগরপুর প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে বাতেন বাহিনীর উল্লেখযোগ্য কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন সুবেদার আবদুল বারী, সুবেদার আলমগীর, নায়েক আবদুস সামাদ, নায়েক আজহার, নায়েক হুমায়ূন, নায়েক আলাউদ্দিন, নায়েক সিরাজুল হক প্রমুখ। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পাক হানাদার বাহিনীর জন্য পালিয়ে যাবার জন্য থানার উত্তর দিক খোলা রেখে থানার তিনদিক (পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম) থেকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানা আক্রমণের অধিনায়ক বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার মেজর এ.কে.এম. আবু তাহের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, "আমি এক্সপ্লোসিভ ব্রাস্ট করে নাগরপুর থানা আক্রমণের সূচনা সংকেত দেয়ার সাথে সাথে আপনারা বাতেন বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডারসহ সকল মুক্তিযোদ্ধা একনাগাড়ে ১০ মিনিট গুলি বর্ষণ এর পর ১০ মিনিট বিরতি, এইভাবে পুনরায় নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে।" নির্ধারিত তারিখে গাঢ় অন্ধকারে ঠিক রাত দুইটার সময় নাগরপুর থানায় অবস্থানরত কুখ্যাত পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাতেন বাহিনীর পক্ষ থেকে বাহিনীর দূরদর্শী ফিল্ড কমান্ডার এবং ঐতিহাসিক নাগরপুর যুদ্ধের সূচনা সংকেত ঘোষণা করেন। যুদ্ধের সূচনা সংকেত পেয়ে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা অধিনায়কের নির্দেশ মোতাবেক মরণপণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। থানায় অবস্থানরত পাক সেনারাও পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। উভয়পক্ষের পাল্টাপাল্টি গুলিবর্ষণের মাধ্যমে তুমুল বেগে যুদ্ধ চলতে থাকে। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর পুলিশ মিলিশিয়াসহ পাক হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা বেশ কিছু গোলা বারুদ রেখে পালিয়ে যায়। পাক হানাদার বাহিনীর এই ভাবে পালিয়ে যাওয়াটা ওদের দুরভিসন্ধিও হতে পারে।

এরপরে জেট জঙ্গী বিমানসহ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে এসে বাতেন বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার একটি পরিকল্পনা থাকতে পারে। উপরোক্ত চিন্তাভাবনা মাথায় রেখে বাতেন বাহিনী নাগরপুর থানা দখল করার পর থানার উপকণ্ঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার, নাগরপুর যুদ্ধের অধিনায়ক সুবেদার মেজর এ.কে.এম আবু তাহেরের নেতৃত্বে উত্তোলনের পর বাতেন বাহিনী গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসে।

একাত্তরে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে বাতেন নামের উপর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার দক্ষিণ প্রান্তে, নাগরপুর উপজেলার উত্তর প্রান্তে ধলেশ্বরী নদীতে এলাসিন ফেরীঘাট। নাগরপুর উপজেলার আবদুল বাতেন নামের একজন হতভাগ্য যুবক টাঙ্গাইল থেকে নাগরপুর যাওয়ার প্রাক্কালে, এলাসিন ফেরী ঘাটে কুখ্যাত পাক-বাহিনীর সম্মুখীন হয়।



ওরা জিজ্ঞেস করে, "তোমহারা নাম কেয়া হায়?" সরল মনে নিজের নামটি আবদুল বাতেন বলার সাথে সাথে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই পর্যায়ে এলাসিন ফেরীঘাটে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। মুক্তিযুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক একদল যুবক বাতেন বাহিনীর রিক্রুট কেন্দ্র টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার লাউহাটী থেকে রিক্রুট হয়ে ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য নৌকা যোগে ধলেশ্বরী নদী দিয়ে ভারতে যাওয়ার পথে এলাসিন ফেরীঘাট অতিক্রম করার সময় (তখন অন্ধকার রাত) পাকবাহিনী ব্রাশ ফায়ার করে নৌকাটি ডুবিয়ে দেয়।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসে বাতেন বাহিনীর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাটি ঘটে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিউর উপজেলার নিরালি গ্রামের একটি বাড়িতে। ঐ বাড়িতে বাতেন বাহিনীর এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধার সন্ধ্যায় ইফতার ও রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ বাড়িতে ঐ দিন মো. আবদুল বাতেন নামের একজন আত্মীয় এসেছিলেন। অন্যান্যদের সাথে ঐ আত্মীয়ও মুক্তিযোদ্ধাদের অজুর পানি এনে দেয়া, ইফতার সামগ্রী এনে দেয়া, নামাজের জন্য জায়নামাজের ব্যবস্থা করাসহ যাবতীয় কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করছিলেন। ইফতারের পর মুক্তিযোদ্ধাসহ সবাই নামাজে (মাগরিবের নামাজ) দাঁড়িয়ে পড়ার সময়ও যার যার পেছনে আগ্নেয়াস্ত্র রেখে দিয়েছিলেন। হয়তো কোনো মুক্তিযোদ্ধার তাঁর আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার অফ করার কথা মনে ছিল না। নামাজ পড়ার সময় কখনো দাঁড়াতে হয়, কখনো বসতে হয়, সেজদা দিতে হয়, এমতাবস্থায় কোনো এক মুক্তিযোদ্ধার পায়ের আঙুলের চাপ লেগে রাইফেল থেকে গুলি বের হয়ে যায়। আশ্চর্যজনকভাবে এবং দুর্ভাগ্যবশত ঐ গুলিটি প্রথমেই গিয়ে লাগে ঐ বাড়ির আত্মীয় মো. আবদুল বাতেনের বুকে। এরপর গুলিটি আবদুল বাতেনের বুক ভেদ করে গিয়ে লাগে বাতেন বাহিনীর আর একজন মুক্তিযোদ্ধার পেটে। এহেন বেদনাদায়ক, লোমহর্ষক, অনাকাঙ্ক্ষিত বড় ধরণের একটি দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে খুব কাছাকাছি থাকা বাতেন বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে সংবাদ পাঠানো হয়। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমি (গোয়েন্দা কর্মকর্তা) বাতেন বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের পরিচালক, বেঙ্গল রেজিমেন্টের চিকিৎসক ডা. জহিরুল ইসলাম ও বাহিনীর আর একজন মুক্তিযোদ্ধা কছিমুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। গুলিতে আহত দুজন রুগিকেই একই ঘরে রাখা হয়েছিল। সেখানে আসার পর এতো রক্ত দেখে কছিম উদ্দিন অজ্ঞান হয়ে যায়। তাকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ডা. জহিরুল ইসলাম তাঁর সাধ্যানুসারে আপ্রাণ চেষ্টা করেও আহত আবদুল বাতেনকে বাঁচাতে পারলেন না। গুলিতে আহত বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর ডা. জহিরুল ইসলামসহ নৌকাযোগে আমাদের ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এমনতর পরিস্থিতিতেও

অত্র এলাকার দেশপ্রেমিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে এসেছিলেন। তারা বাতেনের মরদেহ তার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর যেহেতু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেহেতু তাদের অন্য একটি বাড়িতে নিয়ে পুরো কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধাদের যত্নের সঙ্গে খাবার ব্যবস্থা করেছিরেন। কছিম উদ্দিন সুস্থ হওয়ার পর আমরাও সবার সাথে একত্র বসে খাওয়া দাওয়া করেছিলাম। খাওয়ার পর এলাকার লোকজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে এসেছিলাম।

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ঘটনা হলো টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার পূর্ব পাশ দিয়ে খরস্রোতা নদী ধলেশ্বরী প্রবাহিত। নাগরপুর থেকে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার লাউহাটী আসার পথে ধলেশ্বরী নদীতে বিখ্যাত ধল্লার খেয়াঘাট ছিল, আজও আছে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর নাগরপুর থানায় অবস্থানরত বর্বর পাক-হানাদার বাহিনী নাগরপুর থানা ছেড়ে দিয়ে ধল্লার খেয়া পাড় হয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। সাধারণত বড় খেয়া নৌকায় ছোট বড় দুইজন মাঝি থাকে। ঐ দিন খেয়ানৌকায় শুধু অল্প বয়সের মাঝিটি ছিল। বর্বর পাক-বাহিনী নৌকায় উঠার পর, অল্প বয়সের মাঝিটি ভাবতে লাগলো, কি উপায়ে এদের সমূলে শেষ করে দেয়া যায়? খরস্রোতা ধলেশ্বরী নদী তখন অনেক প্রশস্ত ছিল। খেয়া নৌকার পেছন দিকে বাঁধা হাল ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে নদী পাড়ি দিতে থাকলো। ঐ অল্প বয়সের মাঝি জানতো নৌকার পাইনা খোপের তলা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা আছে। খেয়া নৌকাটি ধলেশ্বরী নদীর মাঝামাঝি অবস্থানে আসার পর মাঝি হাল ছেড়ে দিয়ে পাইনা খোপে গিয়ে তলা খুলে দিয়ে পানি সেচের ভান করতে থাকে। ধীরে ধীরে খেয়া নৌকাটি প্রায় পূর্ব পারে গিয়ে প্রবল স্রোতে ডুবে যায়। খেয়ায় থাকা সকল পাকসেনা পানিতে ডুবে মারা যায়। একজন অল্প বয়সের খেয়া নৌকার মাঝি কাগজে কলমে মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাঁটিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল তা তুলনা বিহীন। বর্বর পাক সেনাদের সকল মরদেহ ধলেশ্বরী নদীর প্রবল স্রোতে দক্ষিণে ভাটির দিকে অর্থাৎ ওরা ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, মরার পরও ওদের মরদেহ ঢাকার দিকেই ভেসে গিয়েছিল। এ ঘটনাটি বাতেন বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যদের মাধ্যমে আমরা অবগত হই।

পরদিন সকালে ধল্লা খেয়াঘাটের পূর্ব পারে ডুবে যাওয়া খেয়া নৌকা হতে এবং নৌকার আশেপাশে ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আমরা বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা উদ্ধার করতে যাই। অনেক কষ্টে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বর্বর পাক-সেনাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ তুলে আনা হয়। এতে দু'টি এল.এম.জি ১০টি জি-থ্রিসহ ৫২টি



স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র এবং অনেক গোলাবারুদ ছিল। অস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধারের এ কর্মযজ্ঞের নেতৃত্বে ছিলাম আমি এবং খন্দকার আবদুল করিম চাতক।

আসলে একটি দেশের মুক্তিযুদ্ধ ধীরে ধীরে যখন জনযুদ্ধে রূপ নেয়, গেরিলা যুদ্ধ ধীরে ধীরে সম্মুখ যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়, তখন এহেন কঠিন কর্মযজ্ঞটিও দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতিরেকে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। পরিশেষে, খেয়া নৌকার সেই অল্প বয়সের তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান মাঝিকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার মোকনা ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালীন বর্ষীয়ান চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খানের এহেন যুদ্ধকালীন সংকটময় পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট কিছু সুচিন্তিত পরামর্শ চাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর সুচিন্তিত, দূরদর্শী পরামর্শ ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরে বলেছিলেন, "এহেন দুর্যোগময় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পারস্পরিক জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু পরামর্শ চাওয়ার আলোকে আমার পরামর্শ: চেয়ারম্যান সাহেব, আপনি মুসলিম লীগের লোক অর্থাৎ পাক বাহিনীর পক্ষের লোক, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে বাহ্যিকভাবে আপনার কথায়, আপনার দেহের ভাষায় বুঝা যাবে আপনি পাকবাহিনীর পক্ষের লোক। কাগজে কলমে আপনার দেহটা পাকহানাদার বাহিনীর পক্ষে থাকবে। তবে অন্তরটা রাখতে হবে মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা, খাওয়ার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে, তাদের জন্য কোনো সময় কোনো বিপদ সংকেত আপনার জানা থাকলে, তা গোপনে জানিয়ে দেবেন। আমার কোনড়া গ্রামসহ অত্র এলাকা আপনার ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পাক বাহিনীর হিংস্র ছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এই কাজগুলো করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই প্রকাশ্যে পাক শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে থাকতে হবে নতুবা তা করতে পারবেন না, নিজেকেও রক্ষা করতে পারবেন না, এলাকাকেও বাঁচাতে পারবেন না। খুবই হিসেব করে পা ফেলতে হবে। প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলতে হবে, খন্দকার বাতেনকে বকাবকি করতে হবে আর অন্তর দিয়ে এদের পক্ষে কাজ করতে হবে। ব্যাপারটা খুবই কঠিন, তবে তা করতে পারলে উভয় কুলই কিছুটা হলেও রক্ষা পেতে পারে।"

বাংলাদেশ ব্যাপী বিশেষ করে দেশের অভ্যন্তরে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সাথে বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রমও ত্বরান্বিত করা হয়। এক পর্যায়ে মোকনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন এর বাড়িতে সংবাদ পাঠিয়ে তাঁর বাড়ির পশ্চিমের ভিটার অর্থাৎ বাড়ির সামনের ঘরটি ভেঙ্গে

অন্যত্র সরিয়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যথারীতি চেয়ারম্যান সাহেবের পরামর্শে ঘরটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এ সময় কোনড়া গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে দিয়ে খুব নিচু খাল (হালট) ছিল, খালে দাঁড়িয়ে একটি বাড়ির শুধু সামনের ঘরটিই দেখা যেতো। বর্ষাকালে নৌকা কিংবা কলাগাছের ভেলা ছাড়া এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার অন্য কোনো উপায় ছিল না। পুরো গ্রামটিতে তখন কোনো সড়ক ছিল না, শুধু নিচু হালট ছিল। গ্রামটি অত্যন্ত নিচু হওয়ার কারণে বেশ কয়েক মাস ব্যাপী বর্ষা থাকতো। এর উপর পানিতে পাট জাগ দেয়ার কারণে পানি পচে ভীষণ মশার উপদ্রব হতো। সেই বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল।" এরই অংশ হিসেবে কোনড়া গ্রাম মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পুলিশ, রাজাকার, মিলিশিয়া ঐ গ্রামে প্রবেশ করতে সাহসই পায়নি। মুক্তযুদ্ধের এক পর্যায়ে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার পাকবাহিনীর থানা কমান্ডার মোকনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুর রহমানকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, "চেয়ারম্যান সাহেব আপনার মোকনা ইউনিয়নের কোনড়া গ্রামে যেতে হবে, বাতেনের বাড়িসহ গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে হবে।" এর উত্তরে চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেছিলেন, "আমি আপনারা বলার আগেই বাতেন এর বাড়ি ঘর ভেঙে তাদের কোনড়া গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।" মোকনা ইউনিয়ন পরিষদের স্বনামধন্য বর্ষীয়ান চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খানের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে পাকবাহিনী আর কোনড়া গ্রামে যায়নি। অথচ মোকনার পাশাপাশি লাউহাটী ইউনিয়ন তখন নাগরপুর থানার অন্তর্গতই ছিল। সেই লাউহাটী গ্রামে ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের বাড়ি, লাউহাটী বাজার পাকবাহিনী জ্বালিয়ে দেয় এবং আশেপাশে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে গিয়ে মা- বোনদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। মোকনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান অত্যন্ত ধনাঢ্য মানুষ ছিলেন। তাঁর বাড়িতে বেশ কয়েকটি বাংলো ঘরই ছিল। বাতেন বাহিনীর শত শত মুক্তিযোদ্ধা ঐ বাড়িতে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পরোক্ষভাবে সাধ্যানুসারে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আর মোকনা ইউনিয়নের পাশের ইউনিয়ন লাউহাটী, কোনড়া গ্রামের পাশের গ্রাম লাউহাটী। লাউহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান খান (কামাল খান)। একাত্তরে বাতেন বাহিনী প্রতিষ্ঠা লগ্নে তাঁর সংরক্ষণ করা রাইফেল দিয়ে বাতেন বাহিনীর কার্যক্রমের সূত্রপাত। অর্থাৎ লাউহাটী ইউনিয়ন পরিষদের বিখ্যাত চেয়ারম্যান আতাউর রহমান খান (কামাল খান) একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাতেন বাহিনীর যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধের ময়দানে মোকনা এবং লাউহাটী ইউনিয়নের পাশাপাাশি বাতেন বাহিনীর সকল কার্যক্রমের সাথে সরাসরি যে সকল ইউনিয়ন



পরিষদের চেয়ারম্যান সর্বতোভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন, তারা হলেন, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার পাকুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ইউসুফ মিয়া, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার (তৎকালীন টাঙ্গাইল সদর থানা), এলাসিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী শ্রীদাম চন্দ্র সাহা, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার (তৎকালীন নাগরপুর থানা) দেউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী মহিনী অধিকারী, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার (তৎকালীন টাঙ্গাইল সদর থানা) আটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সুলতান হাজী, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার (তৎকালীন টাঙ্গাইল সদর থানা) দেলদুয়ার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনছার আলী খান প্রমুখ। এর বাইরেও বাতেন বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপী সমগ্র দক্ষিণ টাঙ্গাইল, ঢাকা জেলার কিছু অংশ, গাজীপুর জেলার অংশ বিশেষ, মানিকগঞ্জ জেলার সমগ্র উত্তরাঞ্চল, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার ব্যাপক অংশের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ ও একাত্তরে যুদ্ধের ময়দানে বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সকল কার্যক্রমে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। তবে এর মধ্যেও যে সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনে প্রাণে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন, রণাঙ্গনে বাস্তবে দেখেছি, তাদের কাউকেই তাদের নিজ বাড়িতে পাওয়া যায়নি। এরপরও মজার ব্যাপার হলো, ঐ সকল ধনাঢ্য চেয়ারম্যান বাড়িতে ও বাড়ির অন্যান্য লোকজন মুক্তযোদ্ধাদের থাকা খাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে।

(২) একাত্তরে বাতেন বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত না করলেই নয়। ব্যারিস্টার শওকত আলী খান (তৎকালীন এম এন এ)-এর সাক্ষাত চাচাত ভাই মো. আজম খান (তিতু মিয়া) মুসলিম লীগের লোক, তৎকালীন বাঙালি দমনের লক্ষ্যে গঠিত পাক বাহিনীর সহযোগিতা সংগঠন শান্তি কমিটি টাঙ্গাইল জেলার সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল শহরে অবস্থান করে আরফান খান এন্ড কোং এর ব্যবসা দেখা শোনা করতেন। সেই সময় বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেনের সাথে আজম খানের পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সহযোগিতার ব্যাপারে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। যুদ্ধকালীন এহেন কঠিন যুগ সন্ধিক্ষণে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার লাউহাটী ইউনিয়নের লাউহাটী গ্রামের আবদুল বাছেদ খান এবং উক্ত ইউনিয়নের পাচুরিয়া গ্রামের খন্দকার আবদুল আলী লালন। একদিন সকাল বেলা বাতেন বাহিনী প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন আজম খান বরাবর বাহিনীর জন্য জরুরী প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্য সামগ্রির তালিকা নির্মাণ পূর্বক একটি পত্র লিখে পাঠান। এতে উল্লেখ ছিল : (১) সাইক্লোস্টাইল মাপার (২) কার্বন পোর (৩) রাইফেল পরিষ্কার করার

ব্রাশ (৪) সিগারেট (৫) কাগজ ইত্যাদি। পত্রটি আবদুল বাছেদ খানের নিকট দিয়েছিলেন। আবদুল বাছেদ খান খন্দকার আবদুল আলী লালনকে সাথে নিয়ে নৌকাযোগে এলাসিন ঘাটে পোঁছে, বেবিতে টাঙ্গাইল রওনা হয়েছিলেন। এরা কাগমারী কলেজ পর্যন্ত যাওয়ার পর টাঙ্গাইল থেকে নাগরপুর রওয়ানা দেয়া একদল পাক বাহিনী এদের বেবি থেকে নামিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এক পর্যায়ে খন্দকার আবদুল আলী লালনকে ছেড়ে দিয়ে আবদুল বাছেদ খানকে গ্রেফতার করে পায়ে হেঁটে নাগরপুরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। খন্দকার আবদুল আলী লালন দ্রুত টাঙ্গাইল গিয়ে আজম খানকে ঘটনা জানান। আজম খান ত্বরিত গতিতে আরফান কোম্পানির পিয়ন গোলাম রসুলকে পত্র মারফৎ পাঠিয়ে ভোরা হতে আবদুল বাছেদ খানকে ছাড়িয়ে নেন। খন্দকার আবদুল বাতেনের পত্রটি বাছেদ খানের পকেটেই ছিল। পত্র খানা দেখে আজম খানও চমকে উঠেছিলেন। যাহোক, তালিকা অনুযায়ী মালামাল নিয়ে দুজনে লাউহাটী চলে আসেন।

(৩) একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাতেন বাহিনীর কার্যক্রমে সা'দত কলেজ করটিয়া, টাঙ্গাইল-এর অবদান একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় নতুন একদেশ, বাংলাদেশ। এ দেশটির জন্মের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ এক ইতিহাস। ইতিহাসের এই পথ চলা সুখকর ছিল না। এই পথ চলার পরতে পরতে জড়িয়েছিল হাজারো বাঁধা বিপত্তি, শোষণ, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার নির্মম কাহিনি। বাঙালির ভাগ্যাকাশে যখন ধারাবাহিক দুর্যোগের ঘনঘটা, সে সময় কাণ্ডারির ভূমিকায় আবির্ভূত হন বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাকে জাতি বঙ্গবন্ধু নামে ডাকতেই বেশি পছন্দ করে, যার ডাকে সারা দেশে বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সারা বাংলাদেশে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে টাঙ্গাইলে ঐতিহাসিক বাতেন বাহিনীর জন্ম হয়। বাহিনীর প্রতিষ্ঠালগ্নে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক, সা'দত কলেজ, করটিয়া ছাত্র সংসদের সাবেক সহ-সভাপতি (ভিপি) খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর বাহিনীর যাবতীয় অফিসিয়াল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে তৎকালীন সা'দত কলেজ, করটিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন চেয়ে নিয়েছিলেন। এই সাইক্লোস্টাইল মেশিনের বদৌলতে বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগপত্র দেয়াসহ বাহিনীর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতো। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন স্বয়ং উক্ত সাইক্লোস্টাইল মেশিনটি সা'দত কলেজ, করটিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সহিত পৌঁছে দিয়েছিলেন।



(৪) বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে হত্যাভিযান শুরু হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ এবং এ গণহত্যা ও নারী নির্যাতন দেশের সর্বত্র চলেছে মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয়টি মাস। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখনও ঢাকাসহ কয়েকটি জেলায় পাকবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা চলে। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সারা দেশে গণহত্যা ও নারী নির্যাতন শুরু করলে তার প্রভাব এসে পরে টাঙ্গাইল জেলার সর্বত্র। এরই অংশ হিসেবে পাক হানাদার বাহিনী দক্ষিণ টাঙ্গাইলের এলাসিনকে টার্গেট করে গণহত্যা ও নারী নির্যাতন করে। প্রথমেই শাকই জোড়া গ্রাম থেকে শুরু করে পাছ-এলাসিন গ্রামে গিয়ে যাদের ধরে ধরে নিয়ে লাইন করে দাঁড় করিয়ে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়, তাঁরা হলেন (১) শহিদ ইয়াছিন আলী (২) শহিদ চান মিয়া (৩) শহিদ জাহাঙ্গীর হোসেন (৪) শহিদ বানিজ মিয়া। এরপর পাক হানাদার বাহিনী এলাসিন বাজারে প্রবেশ করে এলাসিন তারক যোগেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ুয়া দুজন তরুণ তাজা ছেলেকে প্রকাশ্য দিবালোকে বাজারের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে অত্যন্ত জঘন্যভাবে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সারাদেহ রক্তাক্ত করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যাঁদের হত্যা করা হয়, তারা হলো : (৫) শহিদ শ্রী মন্টু লাল সাহা (৬) শহিদ শ্রী বিমল কুমার সাহা। এহেন জঘন্য ঘটনা ঘটানোর পর কুখ্যাত পাক সেনারা এলাসিন বাজারের দোকানদারদের ডেকে হিন্দুদের দোকান লুট করতে আদেশ দেয়। এ ধরণের জঘন্য আদেশ ঘৃণা ভরে নীরবে প্রত্যাখ্যান করে দোকানদাররা বিভিন্ন দোকানের আড়াল দিয়ে এদিক সেদিক চলে যায়। তারপর জঘন্য পাক সেনারা এলাসিন বাজারের দক্ষিণের গ্রাম সানবাড়ী গিয়ে এলাসিন তারক যোগেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য বর্ষীয়ান শিক্ষক আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মানুষ শ্রী যোগেন্দ্রনাথ শীলকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঐ গ্রামেরই আর একজন বর্ষীয়ান ওস্তাদ শ্রী কালীকিংকর সাহাকে পুঁজা মন্ডপের সামনে দাঁড় করিয়ে নৃশংসভাবে গুলি করে মেরে ফেলে।

তাছাড়া টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার মোকনা ইউনিয়নের ধলেশ্বরী নদী সংলগ্ন জগতলা গ্রামে পাক বাহিনী লঞ্চ যোগে গিয়ে ঐ গ্রামের একজন সরকারি ডিলার (খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়ের) প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী কুমোদ বন্ধু নাগকে গুলি করে হত্যা করে। নাগরপুরের বনগ্রামে কুখ্যাত পাকহানাদার বাহিনী আর একটি বড় ধরনের জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। প্রায় অর্ধশত মানুষকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়।

পরিশেষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ডাকে সারা দিয়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ কীর্তি

মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতি এবং দু' লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) ভারতীয় সেনাবাহিনী (মিত্রবাহিনী) ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী সমন্বয়ে গঠিত যৌথ কমান্ডের নিকট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৯৬ হাজার পাক সেনার আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামের একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। সেই সাথে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহান মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন-ভারত হয়ে তাঁর নেতৃত্বে সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী ঢাকায় পদার্পণের পর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) দশ লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, জনতার উপস্থিতিতে তাঁকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেয়া হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করে। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। এক পর্যায়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর দেশের সৈন্য বাংলাদেশ থেকে ফেরত নেয়ার আহ্বান জানান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সারাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নেন।

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর প্রয়োজনে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কোলকাতায় চলে যান। সেখানে গিয়েও তাঁকে নানা বৈরী পরিবেশ, পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। তাই ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আনন্দঘন দিনে বাতেন বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীন সার্বভৌম নতুন বাংলাদেশের মাটিতে এসে পৌঁছাতে পারেননি। অবশ্য প্রবাসী মুজিবনগর সরকারও তখন ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কোলকাতায় অবস্থান করছিল। যাহোক, দেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ কিছুদিন পর বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার বাতেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ হতে ঢাকা এসে পৌঁছান। এরপর বাতেন বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের মাধ্যমে যোগাযোগ পূর্বক বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন মানিকগঞ্জ জেলার (তৎকালীন ঢাকা জেলা) সাটুরিয়া থানা সদরে পৌঁছান। পৌঁছানোর সাথে সাথে বাতেন বাহিনীর সশস্ত্র বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ফিল্ড কমান্ডার সুবেদার আবদুল বারীর নেতৃত্বে গার্ড অব অনার প্রদান



করেন। গার্ড অব অনার পর্ব শেষ হওয়ার পর উক্ত স্থানে বাতেন বাহিনীর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনসহ অত্র এলাকার ছাত্র জনতার একটি সমাবেশ বাতেন বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান মো. আবুল কালাম আজাদ শাজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশের প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা বাতেন বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সাথীদের স্মরণ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। প্রায় পাঁচ মিনিট কোনো কথাই বলতে পারছিলেন না। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাতেন বাহিনীর বেসরকারি প্রধান আলী আকবর খান ডলার, মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, সুবেদার আবদুল বারী প্রমুখ। সভা শেষে খন্দকার আবদুল বাতেন সবার সাথে কুশল বিনিময় করেন। এরপর বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর বাহিনীর তাবত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্নাত কোনড়া যান, যেখানে ঐতিহাসিক বাতেন বাহিনীর জন্ম হয়েছিল। বাতেন বাহিনীর জন্মলগ্নে এই গ্রামটি সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করেছিল। খন্দকার আবদুল বাতেন বাড়িতে পৌঁছে প্রথম তাঁর মা ও উপস্থিত গ্রামবাসীর সাথে কুশল বিনিময় করেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে তাঁর বাহিনীতে যোগদানকারী সেনাবাহিনী, ইপিআর বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার প্রভৃতি বাহিনী থেকে আসা বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তাঁর প্যাডে প্রশংসাপত্র দিয়ে বিদায়ের কার্যক্রম শুরু করেন। যাতে তারা দ্রুত তাদের কর্মস্থলে গিয়ে যোগদান করতে পারেন।

এরপর সিভিলিয়ানদের দিয়ে বাতেন বাহিনী কোম্পানি, প্লাটুন, সেকশন সাজিয়ে আপাতত কিছুদিনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সংরক্ষণ করা হয়। তারপর বাতেন বাহিনীর তাবত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন-এর নিজ বাড়িতে একত্র করে ঐ বাড়ির দুটি ঘর ভর্তি করে রাখা হয়। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ জমা রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেনের প্যাডে প্রশংসাপত্র দিয়ে তাদের তালিকা করে রেখে বিদায় করে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার (তৎকালীন নাগরপুর থানা) লাউহাটীর খেলার মাঠে বাতেন বাহিনীর উদ্যোগে বাতেন বাহিনীর সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী (মিত্র বাহিনী) ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর নিকট জমা দেয়া উপলক্ষ্যে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশের নির্ধারিত দিনে বাতেন বাহিনীর সকল অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সমাবেশ স্থলের পাশে জমা করা হয়। ভারতীয় সেনা বাহিনী (মিত্র বাহিনী)'র কিছু কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বহন করার জন্য ট্রাকসহ

দুপুরেই লাউহাটী এসে উপস্থিত হয়। বিকেল ৩টার দিকে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেনের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শওকত আলী খান এমএনএ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আফতাবুজ্জামান আরজু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, আলী আকবর খান ডলার, এম. এ. রশীদ প্রমুখ। সবশেষে সভার সভাপতি খন্দকার আবদুল বাতেন তাঁর বক্তৃতার প্রারম্ভে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। প্রায় পাঁচ মিনিট তিনি কোনো কথাই বলতে পারছিলেন না। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে খন্দকার আবদুল বাতেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। বক্তৃতা শেষে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভা শেষে বাতেন বাহিনীর তাবত অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বারুদ আনুষ্ঠানিকভাবে বাতেন বাহিনীর অধিনায়ক খন্দকার আবদুল বাতেন এবং ব্যারিস্টার শওকত আলী খান এম এন এ যৌথ বাহিনীর নিকট তুলে দেন। এইভাবে বাতেন বাহিনীর সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী (মিত্র বাহিনী) ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট জমা দেয়ার মধ্য দিয়ে বাতেন বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধকালীন সকল কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



# স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

একাত্তরের মে মাসের ২২ তারিখ। তৎকালীন এম.এন.এ জনাব আব্দুল মান্নান এম আর আখতার মুকুলকে বলেন, "আজ রাত দশটায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটাতে একটি গোপন বৈঠক আছে। আপনি উপস্থিত থাকবেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করার ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনা হবে। দোতলা বাড়ি। উপরের তলায় মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীবর্গ এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আস্তানা। তাই বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে।" জনাব আব্দুল মান্নান এবং এম আর আখতার মুকুল একটু আগেই গিয়ে উপস্থিত হলেন। নিচের তলায় ড্রইং রুমে দুজনে অধীর আগ্রহে বসে রইলেন। ঠিক রাত দশটায় সাদা পোশাকে দুজন ভদ্রলোক এলেন। দু'জনই ভারতীয় বাঙালি। একজনতো তেমন একটা কথাই বলেন না। অন্যজন নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নাম বললেন ভট্টাচার্য। উভয় পক্ষ বিশেষ ভূমিকা না করেই আলোচনা শুরু করলো। ভট্টাচার্য মশাই সরাসরি বললেন, "একটা পঞ্চাশ কিলোয়াট ট্রান্সমিটার বাংলাদেশের সীমান্তে বসানো হয়েছে। এই ট্রান্সমিটার চালু রাখার দায়িত্ব ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে। এর অবস্থানটা স্বাভাবিক কারণেই গোপনীয় থাকবে। তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোলকাতায় প্রতিদিন বেতার অনুষ্ঠান রেকর্ড করতে হবে। রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান ট্রান্সমিটার ভবনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ভারতীয় কর্তৃপক্ষের। অনুষ্ঠান তৈরী করার ব্যাপারে প্রয়োজন হলে অল-ইন্ডিয়া রেডিও'র কর্মচারীরা সাহায্য করতে পারে।" মান্নান সাহেবের অনুমতি নিয়ে এম.আর আখতার মুকুল বললেন, "ট্রান্সমিটারের ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে বাংলাদেশ থেকে যে সব সাংবাদিক, শিল্পী, বেতার কর্মী এপারে চলে এসেছেন, তাঁদের দিয়েই আমরা দিব্যি প্রতিদিনের বেতার অনুষ্ঠানের রেকর্ড করে দিতে পারবো। আমাদের অনুষ্ঠান আমাদের মন মত করে করতে দিতে হবে। অল-ইন্ডিয়া রেডিও'র কর্মচারীদের আশা করি প্রয়োজন হবে না।

এম. আর আখতার মুকুলের বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে মান্নান সাহেব স্পষ্ট বলেই ফেললেন, "আমাদের বেতারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে কিন্তু মুজিবনগর সরকারের নির্দেশ চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এরপর আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকলে মুজিব নগর সরকারের নিকট পেশ করাটা বাঞ্ছনীয় হবে।" ভট্টাচার্য মশাই সম্ভবত এতটা স্পষ্ট কথাবার্তা আশা করেননি। তিনি আবার বললেন, "ভেবে দেখুন প্রোগ্রাম তৈরির ব্যাপারে কোনো রকম সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কিনা?" এবারও মান্নান সাহেব জবাব দিলেন, "নাই, আমাদের প্রোগ্রাম আমাদের লোকজনরাই করতে পারবে।"

এরপর কথা উঠলো, কবে থেকে এই বেতার অনুষ্ঠান চালু করা হবে? এম.আর আখতার মুকুল হঠাৎ করে বলে ফেললেন, "২৫ শে মে ১১ই জ্যৈষ্ঠ থেকে। এই দিন হচ্ছে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শুভজন্মদিন।" ঘণ্টা খানেক কথা বার্তার পর ভট্টাচার্য মশাইয়ের ইশারা পেয়ে তাঁর সহকর্মী জিপ থেকে দুটো পুরানো টেপ রেকর্ডার ও কিছু টেপ এম. আর আখতার মুকুলের নিকট বুঝিয়ে দিলেন। ওরা চলে যাবার পর জনাব আব্দুল মান্নান এবং এম. আর আখতার মুকুল উপর তলায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন সাহেবের নিকট সবকিছুর বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করলেন। তিনি রিপোর্ট পেয়ে খুশি হয়ে বললেন, "তাহলে আপনারা এই বাড়িটাকেই বেতারের রেকর্ডিং স্টেশন বানিয়ে ফেলুন। বেতারের সঙ্গে জড়িত লোকজনও এই বাড়িটাতে থাকা-খাওয়া করতে পারবে। আমি সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমরা ২/১ দিনের মধ্যেই এখান থেকে সি.আই.টি এ্যাভেনু আর থিয়েটার রোডে উঠে যাবো।" বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটাতে প্রতিষ্ঠিত হলো 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।

**প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সূচী ছিলো নিম্নরূপ :** (১) পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত (২) অগ্নিশিখা (মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ অনুষ্ঠান) (৩) বাংলা সংবাদ (৪) রক্ত স্বাক্ষর (গণমুখী সাহিত্যের অনুষ্ঠান) (৫) বজ্রকণ্ঠ (বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠবাণী) (৬) জাগরণী (৭) ইংরেজি সংবাদ (৮) চরমপত্র (৯) দেশাত্ববোধক গান। চরম পত্র রচনা এবং তা পাঠ করার দায়িত্ব দেয়া হলো এম.আর আখতার মুকুলকে। সবার দাবি, ইহা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে হবে। বাংলা সংবাদের দায়িত্বে রইলেন কামাল লোহানী। হাসান ইমাম, সালেহ আহমদ ছদ্মনাম নিয়ে প্রথম দিন বাংলা সংবাদ পড়লেন। বাংলা সংবাদ বুলেটিনের ইংরেজি তর্জমা করলেন এ.টি.এম জালাল উদ্দিন আহমদ। মিসেস টি হোসেন, পারভিন হোসেন ছদ্ম নামে প্রথম ইংরেজি সংবাদ বুলেটিনের ইংরেজি তর্জমা করলেন এ.টি.এম জালাল উদ্দিন আহমেদ। মিসেস টি হোসেন, পারভিন হোসেন ছদ্ম নামে প্রথম ইংরেজি সংবাদ পড়লেন। জয় বাংলা পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরীর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত রেকর্ড করা হলো। অনুষ্ঠান ঘোষণা ও প্রোগ্রামের সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হলো আশফাকুর রহমানকে। আর নিউজ রুম কামাল লোহানীর নেতৃত্বে রইল।

মুজিবনগরে তখন তুমুল উত্তেজনা। নির্ধারিত ২৫ শে মে তারিখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে ইথার সঙ্গে প্রবাহিত হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান। মিডিয়াম ওয়েভ ৩৬১.৪৪ মিটার ব্যান্ডে প্রতি সেকেন্ডে ৮৩০ কিলো সাইকেলে প্রতিধ্বনিত হলো বাঙালি জাতির মর্মবাণী। অধিকৃত এলাকায় বেপরোয়া হত্যা, নারী ধর্ষণ আর অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে যারা দুর্বিষহ জীবন যাপন করছিলেন, মুজিব



নগর সরকারের প্রচেষ্টায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে সবার মধ্যে সৃষ্টি হলো এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান ঘোষক শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে আরও একদল বেতারকর্মী কিছু গানের টেপ সঙ্গে নিয়ে এসে হাজীর হলেন। এরা হচ্ছেন আশরাফুল আলম, মনজোরুল কাদের, সংবাদ পাঠক আলী রেজা চৌধুরী প্রমুখ। সেই সঙ্গে আরো এলেন সালেকিন, প্রণয় রায়, নওয়াব জামান চৌধুরী ও সালাউদ্দিন সাজ্জাদ। এদের সবাইকে কাজে লাগিয়ে দেয়া হলো। এরপর চট্টগ্রাম থেকে বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে এগার জন বেতার কর্মী এসে পৌছালেন। এরা হলেন- সৈয়দ আব্দুস সাকের, মোস্তফা আনোয়ার, রাশেদুল হাসান, কাজী হাবিব উদ্দিন, আবুল কাশেম সন্দীপ, সুব্রত বড়ুয়া, প্রণোদিত বড়ুয়া।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই এগার জনের নাম উল্লেখযোগ্য। পঁচিশে মার্চের প্রাক্কালে এঁরা চট্টগ্রামের বেতার ভবন থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নির্দেশে অনুষ্ঠান প্রচার করছিলেন। কিন্তু পঁচিশে মার্চে বীভৎস হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার পর আগ্রাবাদস্থ বেতার ভবন থেকে অনুষ্ঠান বন্ধ হলে, এই এগার জন দুঃসাহসী বেতার কর্মী কালুর ঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে জমায়েত হন। কেননা এই ট্রান্সমিটার থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব। ট্রান্সমিটারটি শহরের অন্য প্রান্তে কালুরঘাটে। বেশ কিছুটা নিরাপদ রয়েছে। বেলাল মোহাম্মদ বেতার কেন্দ্রের নামকরণ করেছিলেন 'বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। সৈয়দ আব্দুস শাকের গ্রহণ করেছিলেন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের প্রকৌশলগত সার্বিক দায়িত্ব। তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন বেতার প্রকৌশলী সরফুজ্জামান ও আমিনুর রহমান। সমগ্র বাংলাদেশে তখন শুরু হয়েছে ব্যাপক হত্যা, অগ্নিকাণ্ড আর ধ্বংসলীলা। এর মধ্যে আকস্মিক ভাবে ২৬ শে মার্চ দুপুরে কালুরঘাট ট্রান্সমিশন থেকে ইথার তরঙ্গে ভেসে এলো, বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র বলছি...। বেলাল মোহাম্মদের কণ্ঠ থেকে প্রচারিত হলো প্রথম বেতার কথিকা 'হানাদার' দুশমন। ওদের ক্ষমা নেই– ক্ষমা নেই। স্বাধীন বাংলার প্রতিটি গৃহ এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ।

বাঙালি আজ জেগেছে,
জয় নিপীড়িত জনগণের জয়
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান
জয় স্বাধীন বাংলা।

চট্টগ্রামে বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটির সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল, তিনি হচ্ছেন এম.এ হান্নান। চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি এম.এ হান্নানের সক্রিয় সহযোগিতায় বেলাল মোহাম্মদ ও অন্যান্য বেতার কর্মীরা এই

দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বেতার কেন্দ্রটি চালু হওয়ার পর এম.এ হান্নান জাতির উদ্দেশ্যে এক বৈপ্লবিক ভাষণও প্রদান করেছিলেন। এই বেতার কেন্দ্র থেকেই ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। দিন কয়েকের বেশি এই বেতার কেন্দ্র স্থায়ী হতে পারেনি। হানাদার বাহিনীর বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল কালুরঘাটের ট্রান্সমিটারটি। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের এহেন যুগসন্ধিক্ষণে এই বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যে দায়িত্ব পালন করেছে তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এর কর্মীরা বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মুজিবনগরে উপস্থিত হওয়ায় নবগঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের মনোবল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলো। এরপর এলেন রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান সংগঠক মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, অনুষ্ঠান প্রযোজক অনু ইসলাম, খুলনা বেতারের টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্ট মমিনুল হক চৌধুরী আর অনুষ্ঠান ঘোষক মোতাহার হোসেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে বহু বেতারকর্মী, শিল্পী, নাট্যাভিনেতা, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক এসে হাজির হলেন। তাই অনুষ্ঠানের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া হলো। সংবাদ বিভাগের সার্বিক দায়িত্বে রইলেন কামাল লোহানী ও সুব্রত বড়ুয়া। ইংরেজি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে বহন করছেন আলমগীর কবির ও আলী যাকের। কিছুদিনের জন্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ইংরেজি সংবাদ ভাষ্য প্রচার করলেন জামিল আখতার ছদ্ম নামে। উর্দু অনুষ্ঠান পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন শহীদুল হক ও জাহেদা ছিদ্দিকী। আশ্চর্য হলেও বলতে হয় যে, আলমগীর কবির পেশায় চলচ্চিত্র পরিচালক, আলী যাকের বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী, মওদুদ আহমেদ ও গাজীউল হক আইন ব্যবসায়ী আর শহিদুল হক ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসায় পারদর্শী। অথচ জাতির দুর্যোগে এঁরা বেতার অনুষ্ঠান পরিচালনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেন।

শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক শওকত ওসমান, সৈয়দ আলী আহসান, ড. মাজহারুল ইসলাম, ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক আব্দুল হাজীজ, অধ্যাপক বদরুল হাসান প্রমুখ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে কথিকা প্রচার শুরু করলেন। সাংবাদিকদের মধ্যে ফয়েজ আহমেদের 'পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে', আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'বিচার প্রহসন' আর আমীর হোসেনের 'সংবাদ পর্যালোচনা' ধারাবাহিকভাবে প্রচার শুরু হলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সবার জন্য সামান্য কিছু পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হলেও সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ কোনো প্রকার পারিশ্রমিক গ্রহণ করলেন না। সাংবাদিকদের মধ্যে আরো যারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ



করলেন তাঁদের মধ্যে সলিমুল্লাহ (ইলিয়াস আহমেদ), মহাদেব সাহা, রমেশ দাস গুপ্ত, সাদেকিন, আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী, গাজীউল হাসান খান, আমিনুল হক বাদশাহ প্রমুখ অন্যতম। এছাড়া কবি সেকান্দার আবু জাফর, কবি আজাদ চৌধুরী, কবি নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখলেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রখ্যাত সাহিত্যিক শওকত ওসমানের জ্বালাময়ী লেখা 'ইয়াহিয়া জবাব দাও' শওকত ওসমানের ভাষায় বলতে গেলে মিথ্যাবাদির সঙ্গে যে সমাজ করে সেও মিথ্যুকে পরিণত হয়। সঙ্গদোষ। ইয়াহিয়া জবাব দাও, তুমি কেন ওয়াদা খেলাপ করলে? চট্টগ্রামের বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত অন্যতম বেতার কর্মী ও তরুণ লেখক মোস্তফা আনোয়ার তাঁর অমর বেতার কথিকায় লিখলেন, দাংগাবাজী কলাকৌশল আর চলবে না। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত দরিদ্র বাঙালি গণমানুষ ওদের কলঙ্কিত রাজনীতির মুখোশ উন্মোচিত করেছে। ওদের নগ্ন আসল রূপটি অতি দুর্ভাগ্যের রাত্রে আমরা দেখে ফেলেছি– পশুও বুঝি এত নগ্ন এত বিশ্রী, এত কুৎসিত, এত বীভৎস নয়। ওরা মানুষ হত্যা করেছে– আসুন আমরা পশু হত্যা করি।

অত্যন্ত দ্রুত 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' একটি পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান 'অগ্নিশিখার' দায়িত্ব দেয়া হলো টি এইচ সিকদারকে। ধারা বর্ণনা ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করলেন আশরাফুল আলম। এছাড়া নাটকে মোস্তফা আনোয়ার, সঙ্গীতের তাহের সুলতান, কথিকায় মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, সাহিত্যে মোহাম্মদ ফারুক আর (ইনি শাজাহান ফারুক ছদ্দনামে সংবাদ পাঠ করতেন) প্রতিধ্বনি ও সোনার বাংলা নামে দুটি অনুষ্ঠান শহীদুল ইসলামের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হলো। অনুষ্ঠানগুলোর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন আশফাকুর রহমান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নীতি নির্ধারণ, মুজিব নগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, অর্থ সংগ্রহ এবং কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদির দায়িত্ব পালনের জন্য তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নানের পরামর্শ দাতা হিসাবে রইলেন কামরুল হাসান, মুজিব নগর সরকারের তথ্য সচিব আনোয়ারুল হক খান এবং তথ্য ও প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর এম. আর আখতার মুকুল। পাকিস্তান সরকারের কর বিভাগের কর্মচারী আনোয়ারুল হক খান, একাত্তরের জুন মাসে কাফি উপলক্ষ্যে লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হলে তিনি অনতিবিলম্বে সরাসরি মুজিব নগরে এসে হাজির হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইনি ছিলেন সরকারের প্রথম তথ্য সচিব।

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক সমর দাস যে অমানুসিক পরিশ্রম করে আমাদের সঙ্গীত অনুষ্ঠানগুলোকে সাফল্য মণ্ডিত করেছিলেন তার উল্লেখ না করলে

অমার্জনীয় অপরাধ হবে। সীমিত সংখ্যক বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পী নিয়ে শুধু আন্তরিক নিষ্ঠা আর অদম্য উৎসাহের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কোনো সাউন্ড প্রুফে রেকর্ডিং স্টুডিও ছিল না। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটার যে ছোট্ট কক্ষে এক সময় মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমেদ থাকতেন, বেতার কর্মীরা সেই কক্ষটার চার দিকের দেয়ালে বিছানার চাদর ও কাপড় ঝুলিয়ে দরজা ও জানালার ছিদ্রগুলো বন্ধ করে রেকর্ডিং স্টুডিও বানিয়েছিল। সেখানেই ছিল এদের দুটো ভাঙ্গা টেপ রেকর্ডার। এই রেকর্ডিং রুমটা আর নিউজের জন্য পাশের রুমের একাংশ ছাড়া সমস্ত বাড়িটার কোথাও আর পা রাখার জায়গা ছিল না। সর্বত্র ছিল বেতার কর্মী ও শিল্পীদের বিছানা। এই সময় বাড়িটাতে প্রায় সত্তর জন লোক রাত্রি যাপন করতেন। টয়লেট ছিল মাত্র দুটো। অবশ্য সবার জন্য মুজিব নগর সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় দু'বেলা খাবার ব্যবস্থা করা হতো। এই অবস্থার মধ্যেই কামাল লোহানী ও জালাল উদ্দিনকে নিউজ লিখতে হয়েছে। আলী জাকের ও আলমগীর কবিরকে ইংরেজি অনুষ্ঠান তৈরি করতে হয়েছে। শহীদুল হক ও জাহেদ ছিদ্দিকীকে উর্দু অনুষ্ঠানের টেপ রেকর্ডিং করতে হয়েছে। 'জল্লাদের দরবার' ও চরম পত্রের রেকর্ডিংও করতে হয়েছে। কোথাও কারো কাছ থেকে তেমন কোনো অভিযোগও উত্থাপিত হয়নি। সবাই ছিল এক ও অভিন্ন প্রাণ। সবার চোখের সামনে সব সময়েই দুটো জিনিস জ্বলজ্বল করে ভাসতো। প্রথমটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ। আর দ্বিতীয়টি শত্রু দখলকৃত এলাকায় মানুষের দুর্বিষহ জীবন যাত্রা।

কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে আব্দুল জব্বার, অজিতরায়, সরদার আলাউদ্দিন, মোকসেদ আলী, আপেল মাহমুদ, কাদেরী কিব্রিয়া, রথীন্দ্রনাথ রায়, হরলাল রায়, অরূপ রতন চৌধুরী, তপন ভট্টাচার্য, স্বপ্ন রায়, শাহ আলী সরকার, কল্যাণী ঘোষ, লাকী আহমদ, মনজুর আহমদ, তোরাব আলী শাহ, গোপীনাথ, রূপা খান, মালা খান প্রমুখ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছেন। আব্দুল জব্বারের কণ্ঠে 'সালাম সালাম হাজার সালাম' আর আপেল মাহমুদের কণ্ঠে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'... এই দুটো গান বাঙালি জাতির মনের মনি কোঠায় অমর হয়ে রইবে। এতগুলো বছর পরেও কোনো অবসর মুহূর্তে এই দুটো গান শুনলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নাটকের সফলতা একবাক্যে স্বীকৃত হয়েছে। নাট্যশিল্পীদের মধ্যে হাসান ইমাম, সুভাষ দত্ত, রাজু আহমেদ, নারায়ণ ঘোষ, মাধুরী চ্যাটার্জী, মাহমুদা আখতার রেবা, সৈয়দ মোহাম্মদ চান, কল্যাণে মিত্র, আশরাফুল আলম, মিঠু, বুলবুল মহালনবীশ, মামুনুর রশিদ প্রমুখ নিয়মিত ভাবে নাটকে অংশগ্রহণ



করেছেন। প্রখ্যাত নাট্যকার কল্যাণ মিত্রের লেখা 'জল্লাদের দরবার' নাটকে ইয়াহিয়া খানের ভূমিকায় রাজু আহমদের অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উভয় বাংলায় এমন দরাজ কণ্ঠের অভিনয় তো আজও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঘাতকের নির্মম বুলেটে রাজু আহমদ নিহত হয়েছেন। কিন্তু বাংলা নাট্যজগতে রাজু আহমদের শূন্যস্থান এখন পর্যন্ত পূরণ হলো না।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়মিত অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার মাসখানেকের মধ্যে আরো কিছু শিল্পী, সাহিত্যিক ও বেতারকর্মী এসে জড়ো হলেন। এদের মধ্যে নাছিম চৌধুরী, নূরুন্নাহার মাজহার, উম্মে কুলসুম, নাসরিন আহমদ, মুজিব বিন হক, নেয়াজিশ হোসেন, নূরুল ইসলাম, গণেশ ভৌমিক, গাজিউল হাসান খান ছাড়াও রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক মুহাম্মদ ফারুক, মোস্তাফিজুর রহমান ও অনুষ্ঠান ঘোষক আবু ইউনুস, চট্টগ্রাম বেতারের ইয়ার মাহমুদ, মনতোষ দে, হাবীবুল্লাহ চৌধুরী, ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান ঘোষক মহসিন রেজা, অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধায়ক একে শামসুদ্দিন প্রমুখ অন্যতম। আশ্চর্য হলেও একথা সত্য যে, দখলকৃত বাংলাদেশের ছ'টা বেতার কেন্দ্র থেকে মাতৃভূমির সেবার উগ্র বাসনা আর বিবেকের দংশনে বিপুল সংখ্যক বেতার কর্মী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এসে যোগদান করলেও কোনো আঞ্চলিক বেতার পরিচালক তো দূরের কথা, একজন সহকারী বেতার পরিচালক পর্যন্ত 'ডিফেক্ট' করেননি। অথচ ছ'টা বেতারকেন্দ্রের চারটাই হচ্ছে সীমান্ত এলাকায়।

বিভিন্ন ধরণের বাধা, সীমাবদ্ধতা, অসুবিধা এবং এতো সব প্রতিকূল পরিবেশের মাঝেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন অনুষ্ঠান চালু রাখতে হয়েছে। দখলকৃত এলাকার ছয়টি বেতার কেন্দ্র থেকে অবিরাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সেখানে বিষোদগার করা হয়েছে, তার মোকাবেলা করতে হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সৌভাগ্য যে, বহুশিল্পী, নাট্যকার, যন্ত্রশিল্পী, বেতারকর্মী, সাংবাদিক, লেখক আর শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয়েছিল। এঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একজন বুদ্ধিজীবী শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসান যে দিন তাঁর নিজস্ব রচিত কথিকা প্রচারের জন্য বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটার স্টুডিওতে এলেন সেদিন বেতার কর্তৃপক্ষ দারুণভাবে উৎসাহিত হলো। রেকর্ডিংয়ের প্রাক্কালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'স্যার আপনার স্ক্রিপ্ট কোথায়'? জবাবে মিষ্টি হেসে বললেন, 'স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন হবে না। কমিটি বলতে হবে তাই শুধু বলে দাও।' রেকর্ডিং শুরু হলো। পাঁচ মিনিটের কথিকা, চার মিনিট ৫০ সেকেন্ডের মাথায় তাঁর কথিকা শেষ করলেন। দশ সেকেন্ডে সময় অনস্টপ ঘোষকের জন্য। সৈয়দ সাহেব স্ক্রিপ্ট ছাড়া তাঁর কথিকা রেকর্ডিংয়ের সময় কোথাও একবার আটকালেন না। সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বললেন,

'বুঝলে, ব্রিটিশ আমলে হিন্দুদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে আমিও এক সময় অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করতাম।'

ড. মাজহারুল ইসলাম একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তিনি সেদিন স্টুডিওতে এসে তাঁর কথিকা 'বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু' রেকর্ডিং করলেন। বেতারের লোকজন বাংলা ভাষার উপর তাঁর দখল দেখে চমৎকৃত হলো। ড. আনিসুজ্জামান-এর লেখা 'অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অমূল্য সম্পদ। এ ছাড়াও শওকত ওসমান, সিকান্দার আবু জাফর, জহির রায়হান, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী, রমেশ দাস গুপ্ত, গাজিউল হক, সলিমুল্লাহ, আমীর হোসেন, আসাদ চৌধুরী ও মহাদেব সাহা প্রমুখের মত লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কবি, সাহিত্যিক আর সাংবাদিকের দল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তাঁদের অমর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সংবাদ পাঠক হিসাবে হাসান ইমাম, কামাল লোহানী, বাবুল আখতার, পারভিন হোসেন, আলী যাকের আর জাহেদ ছিদ্দিকী যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠান ঘোষণায় আশফাকুর রহমান আর মাজহারুল ইসলামের মত সাবলীল ও দরাজ কণ্ঠস্বর আজও খুঁজে পাওয়া গেল না।

কণ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে আব্দুল জব্বার, অজিত রায়, এম. এ. মান্নান, আপেল মাহমুদ, কাদেরী কিবরিয়া, রথীন্দ্রনাথ রায়, সরদার আলাউদ্দীন, মোকসেদ আলী সাঁই, মান্না হক, তপন ভট্টাচার্য আর অরূপ রতন চৌধুরী এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তাঁদের অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। উভয় বাংলায় আজ এঁরা প্রতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পী হিসেবে স্বীকৃত। শিল্পীদের মধ্যে আরও ছিলেন শাহীন সামাদ ও গাজী আবদুল হাকীম (বাঁশিতে)।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এর অনুষ্ঠানগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। এ সব অনুষ্ঠান রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গভীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা ছাড়াও দখলকৃত এলাকার জনসাধারণের মনোবল বৃদ্ধি করলো। লক্ষ্য করা গেল যে, দখলকৃত এলাকায় ৬টা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে যতষোবিমোদগারই করা হোক না কেন, এখানে বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারের নাম উচ্চারণ করা হচ্ছে না। কেননা এতে করে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব বেতার কেন্দ্রের স্বীকৃতি দেয়া হবে। তাই বিভিন্ন সেক্টর থেকে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যখন দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বর্বর হত্যাকাণ্ড, নারীর অবমাননা, ধর্মীয় স্থান অপবিত্রতার মত নানা ধরণের মানবতা বিরোধী অভিযোগ উপস্থাপন শুরু করা হলো, তার কোনো পরিষ্কার জবাব এ সব বেতার কেন্দ্র থেকে দিতে



ব্যর্থ হলো। উপরন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম উচ্চারণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ওদের শত গালাগালি সব আকাশ বাণীর বিরুদ্ধে প্রচার হলো।

একাত্তরের জুলাই মাসের প্রথম দিকে একদিন মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সামগ্রিক দায়িত্বে নিয়োজিত জনাব আব্দুল মান্নান ও এম আর আখতার মুকুলসহ কয়েকজনকে ডাকলেন। নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে কিছু আলোচনার পর বললেন, পাকিস্তান বেতার থেকে সে অবিরাম আমাদের অমুকের এজেন্ট, অমুকের দালাল? এম আর আখতার মুকুল বললেন, 'আমরা প্রোপাগান্ডা যুদ্ধে ডিফেন্সে যেতে চাই না' 'যে মুহূর্তে আমরা অভিযোগ অস্বীকার করে প্রতিবাদ করতে যাবো, সেই মুহূর্তেই আর এ অভিযোগ খণ্ডন করবার পুরো দায়িত্বই তখন আমাদের। তাই ওরা যে অভিযোগ গাইড স্থাপন করুক না কেন, আমরা তার জবাব না দিয়ে পাল্টা বর্বর হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন ও ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করার অভিযোগ উপস্থাপন করে ওদের ডিফেন্সে ফেলবো। আর আমরা যখন দিন তারিখ ক্ষণ ও স্থান উল্লেখ করে এ সব ঘটনার কথা বলছি, তখন বাংলার মানুষ তার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। তাই প্রোপাগান্ডায় ওরা আমাদের সঙ্গে পারবে না।' প্রধানমন্ত্রী এম. আর আখতার মুকুলের যুক্তির সঙ্গে একমত হলেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যতদিন চালু ছিলো, তত প্রোপাগান্ডার ক্ষেত্রে বেতারের লোকজন এগ্রো সিভ ছিলো। কোনো সময়েই নমনীয় নীতি গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে লড়াই করেছে তা সঠিক-নির্বাসিত সরকার বাঙালি জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যে ভূমিকা পালন করেছে তা প্রশ্নাতীত-আর দখলিকৃত এলাকার প্রতিটি মানুষ যেভাবে সহযোগিতা করেছে, তা নির্ভুল। উপরন্তু স্বদেশপ্রেম হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তার বলিষ্ঠ নীতি ও উন্নত মাপের অনুষ্ঠানের জন্য অচিরেই পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। বিশেষ করে 'জল্লাদের দরবার' ও 'চরমপত্র' মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকলো। ২০/২২ বছর ধরে সে সব পূর্ব বঙ্গীয় বাস্তুহারা ওপারে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাঁরা বহুদিন পরে বাংলা ভাষায় বেতার অনুষ্ঠান শুনতে পেয়ে হতবাক হলেন। কোলকাতায় বাসে, ট্রামে, খেলার মাঠে-সর্বত্রই ভিড়ের চাপ বৃদ্ধি পেলে রংবাজ ছোকরাদের মুখে মুখে ফিরতো 'চরমপত্র'র অনুষ্ঠানের সেই ট্রেডমার্ক কথা– এলাকায় কেমন বুঝতাছেন?

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ইংরেজি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের কৃতিত্ব দুজনের। একজন হচ্ছেন প্রখ্যাত নাট্যকার আলী যাকের এবং আরেকজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক আলমগীর কবির। দুজনেই তখন অধিকৃত এলাকার অবস্থানকারী,

আত্মীয় স্বজনদের নিরাপত্তার খাতিরে আবু মোহাম্মদ আলী আর আহমেদ চৌধুরী ছদ্মনামে ইংরেজি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তবে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এঁরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। পরবর্তীকালে স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে আলী যাকের এক জায়গায় লিখেছেন, '২৫শে মার্চ রাত্রি এগারোটায় বাংলার মানুষের জীবনের একটি অধ্যায়ের শুরু। এর মাঝের অধ্যায়টি ভরা থাক নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে। কিন্তু এই অশ্রু বিন্দু গত নয় মাসের সংগ্রামের মাঝ দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে মুক্তোয়, সংগ্রামের ত্যাগ, তিতিক্ষায় গাঁথা স্বাধীনতার মুক্তোর মালা।'

**১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নয় মাস সময় বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার জন্যই ঘটনাবহুল আর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরপুর। এর সমন্বয় করলেই সৃষ্টি হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বলতে হয় যে, আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইতিহাসকে বিকৃত করে লেখা হয়েছে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বিকৃত ইতিহাসকে বাতিল করে প্রকৃত ইতিহাসের একটি রূপরেখার ঘোষণা বা রায় দেয়ার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস লেখার একটা উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'সংশপ্তক', 'বহুব্রীহি' সহ বেশ কিছু স্বাধীনতার লড়াইভিত্তিক ধারাবাহিক নাটক বিটিভিতে দেখানো হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই 'ওরা এগারো জন' এবং 'জীবন থেকে নেয়া' বেশ কিছু স্বাধীনতার লড়াইভিত্তিক চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। বীর মুক্তিযোদ্ধা নাছির উদ্দিন আহমেদ বাচ্চুর পরিচালনায় পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবি 'গেরিলা' মুক্তি পায়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান শুরু করার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এ অনুষ্ঠান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্প ও সেক্টর কমান্ডারদের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি পত্র আসছিল। যুদ্ধের অবস্থা দেখার জন্য আর বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রায়ই মুজিব নগর থেকে খুলনা-যশোর সেক্টরে যাতায়াত শুরু করেছিলেন 'চরমপত্রের' রচয়িতা এম আর আখতার মুকুল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আকস্মিক তিন দিনের ধর্মঘটের ফলে মুজিব নগর সরকার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে। যদিও প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমেদ তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন এবং আব্দুল মান্নান এম এন এ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছিলেন, তবুও একজন তথ্য সচিবের প্রয়োজন দেখা দিলো। এরই ফলে লন্ডনে যোগাযোগ স্থাপন করে



আনোয়ারুল হক খানকে নতুন তথ্য সচিব নিয়োগ করা হয়। ইতোমধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় চারটা দপ্তরের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমত, বেতার দফতর, দ্বিতীয়ত, শিল্পী কামরুল হাসানের অধীনে আর্ট ও ডিজাইন দফতর, তৃতীয়ত, চিত্র প্রযোজক আব্দুল জব্বারের অধীনে চলচ্চিত্র দফতর আর চতুর্থ, এম.আর আখতার মুকুলের পরিচালনায় তথ্য ও প্রচার বিভাগ। অত্যন্ত দ্রুত তথ্য ও প্রচার দফতর সম্প্রসারিত হলো।

ওয়াশিংটনে সর্বজনাব এনায়েত করিম, এ.এম.এ মুহিত, এ.এস.এম কিবরিয়া, এস.এ করিম, এ মাহমুদ আলী, লন্ডনে মহিউদ্দিন চৌধুরী, হংকংয়ে মহিউদ্দীন আহমদ আর টোকিওতে ডিফেক্ট করা কূটনীতিবিদ মাসুদ আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নিয়মিতভাবে যুদ্ধের খবরাখবর ও নিউজ ফটোগ্রাফ পাঠানো শুরু হলো। এ ছাড়াও তথ্য ও প্রচার দফতরের বিশেষভাবে ইংরেজিতে প্রকাশিত বই-পুস্তক, পোস্টার ফোল্ডার ও নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ বেতারের প্রতিনিধিদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হলো। ফলে আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশন মারফত মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে উঠলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুস সামাদের সহযোগিতায় তথ্য ও প্রচার দফতর থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ফরাসি ভাষায় একটা রঙিন ফোল্ডার প্রকাশ করলো। অন্যদিকে রণাঙ্গন থেকে সরাসরি যুদ্ধের খবর পাবার জন্য এগারোটা সেক্টরের অনেকটাতেই বিশেষ সংবাদদাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হলো। এদের মধ্যে অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ, আব্দুল্লাহ আল ফারুক, চট্টগ্রামের আবুল মনজুর প্রমুখ অন্যতম। প্রতিরক্ষা সচিব আব্দুস সামাদের সহযোগিতায় প্রত্যেক সমর সংবাদদাতাকে একটা করে টেপরেকর্ডার দিয়ে রণাঙ্গনে পাঠানো হলো। এঁদের পাঠানো সংবাদ পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বুলেটিনে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরই পাশাপাশি বেসামরিক প্রশাসনের সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে যে দশটা জোনে ভাগ করা হয়েছিল, তার প্রতিটি জোনে তথ্য ও প্রচার দফতরের প্রকাশিত বই, পুস্তক, ফোল্ডার, পোস্টার, প্রচারপত্র ইত্যাদি বিতরণের জন্য (অফিসার) কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এই সব কর্মকর্তার মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প ছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হাটে-বাজারে প্রচারপত্র ও বই-পুস্তকগুলো দেদার বিতরণ শুরু করলো। আগস্ট মাসের শেষ দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল যে, সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ধ্যার পর শত্রু সৈন্যরা তাদের বাংকার ও ক্যাম্প থেকে বেরুনো এক রকম বন্ধ করে দিয়েছে। এর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রকাশিত প্রচারপত্রগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পৌছানোর সুবিধা হলো এই সময় ফরিদপুর-বরিশাল অঞ্চল পর্যন্ত রাস্তার পাশে প্রকাশ্য স্থানে বিশিষ্ট শিল্পী কামরুল

হাসানের অঙ্কিত সারা জাগানো পোস্টার 'এই জানোয়ারকে হত্যা করতে হবে' শোভাবর্ধন করতে দেখা গেছে।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে একটা খবরে বেতার কর্তৃপক্ষ বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়লো। দখলদার বাহিনী যত্রতত্র শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রায় সবার কাছ থেকে পরিচয় পত্র দাবি করছে। কেউ পরিচয়পত্র দেখাতে না পারলে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর লোক হিসাবে সন্দেহ করে গ্রেফতার করছে। এর মোকাবেলায় দিন কয়েকের মধ্যেই নমুনা হিসাবে কয়েকটা 'আইডেনটিটি কার্ড' সংগ্রহ করে অফসেট পদ্ধতিতে প্রথম দফায় পাঁচ লাখ নকল কার্ড ছাপাবার ব্যবস্থা করা হলো। এরপর জোনাল অফিসের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এ সব হুবহু নকল কার্ড বিতরণ শুরু হলে নিরীহ গ্রামবাসী অযথা হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

যাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় এই সব নকল 'আইডেনটিটি কার্ড' মাত্র দিন কয়েকের মধ্যে ছাপানো সম্ভব হয়েছিল তাঁর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভদ্রলোকের আদিবাড়ি মুন্সীগঞ্জে। বিভাগ পূর্ব যুগে তিনি কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করতেন। পরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কশাস্ত্রে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। 'র‍্যাডিয়েন্ট প্রসেস' নামে কোলকাতায় একটা প্রেস চালু করেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক আলমগীর কবীরের মাধ্যমে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে এম. আর আখতার মুকুলের প্রথম পরিচয়। নাম নিরোদ বরণ মুখার্জী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিব নগর সরকারের সমস্ত বই-পুস্তক, পোস্টার প্রচারপত্র, ফোল্ডার, এমনকি নকল আইডেনটিটি কার্ড এই 'র‍্যাডিয়েন্ট প্রসেস' প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছিল। কি আশ্চর্য মি. মুখার্জী বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এতোগুলো বছরের মধ্যে একবারও বাংলাদেশে আসেননি কিংবা বাংলাদেশ দেখার আগ্রহ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায়ই তিনি এম আর আখতার মুকুলকে বলতেন, 'আপনাদের সহযোগিতা করতে পারছি, এটাই আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। দূর থেকে দেখবো আমার জন্মভূমিও সার্বভৌম এবং স্বাধীন।'

একাত্তরের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকের কথা। ভর দুপুরে একনম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তথ্য ও বেতার দফতরে বসে একগাদা প্রতীক দেখছিলেন এম আর আখতার মুকুল। মাঝে মাঝে খবর নিচ্ছিলেন যে জোনাল অফিসগুলোতে এবং বিদেশে ছয়টা বাংলাদেশ মিশনে পাঠাবার জন্য সবগুলো প্যাকেট তৈরি হয়েছে কিনা? এই সব প্যাকেটে তথ্য দফতরের প্রকাশিত বই, প্রচারপত্র, ফোল্ডার এমনকি বড় বড় পোস্টার পর্যন্ত রয়েছে। এই পোস্টারগুলোর একটা শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা 'এই জানোয়ারকে হত্যা করতে হবে'। বিদেশিদের জন্য ইংরেজিতে ছাপা হয়েছে।



একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনার সময় হঠাৎ করে একটা বিশেষ সুবিধার বিষয় উপলব্ধি করা গেল। বাঙালি গ্রামীণ সমাজে যে ভাবে কুলবধূরা ভাসুরের নাম মুখে আনতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় ছ'টি বেতার কেন্দ্র তাদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডার কোথাও 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'র নাম ধরে গালাগাল করতে পারছে না। কেননা যখনই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করবে, তখনই মুজিব নগর সরকার ও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্রের অস্তিত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করতে হবে। এটাই হানাদার বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে জোরালো ভাষায় যত অভিযোগ উত্থাপন করা হতো হানাদার বাহিনী কবলিত বেতার কেন্দ্রগুলো তার সরাসরি জবাব দিতে অপারগ ছিল। তারা যেটুকু জবাব দিতো তার সবটাই ভারতের 'আকাশ বাণীকে' গালাগাল করে দিতে হতো। এটা ছিল অনেকটা 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাবার মতো।

তাই বেতার কর্তৃপক্ষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনার সময়ে আক্রমণাত্মক নীতি অব্যাহত রেখেছিল। বেতার কর্তৃপক্ষের নীতি ছিল প্রথমত, মুক্তিযোদ্ধাদের শৌর্য-বীর্যকে বিশেষভাবে তুলে ধরা। দ্বিতীয়ত, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মারপ্যাঁচকে সহজ সরল ভাষায় সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে উপস্থাপিত করা। তৃতীয়ত, নির্বাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি আলোকপাত করা। চতুর্থত, হানাদার বাহিনী কর্তৃক গৃহীত সমগ্র বাঙালি জাতির একাত্মবোধকে অব্যাহত রাখা। আর সর্বোপরি অধিকৃত এলাকায় হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধর্মীয় স্থান অপবিত্রকরণ সংক্রান্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান এবং শত বিপদ-আপদের মধ্যেও সাধারণ মানুষের মনোবলকে চাঙা রাখা।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনায় এ সব নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমেদ, বেতারের দায়িত্বে নিয়োজিত টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান এবং মুজিবনগর সরকারের তৎকালীন তথ্য সচিব জনাব আনোয়ারুল খান-এর অবদান অনস্বীকার্য। এতোগুলো বছর পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অতীতের এসব কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নে অনুধাবন করা যায় যে, বিদেশের মাটিতে বসে আর সীমিত লোকবল ও সম্পদ সত্ত্বেও বেতার কর্তৃপক্ষের গৃহীত নীতি সুষ্ঠু ও সঠিক ছিল। তাইতো আমরা দেশবাসী লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিলাম।

পরিশেষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠকীর্তি মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দক্ষ নেতৃত্বে, তৎকালীন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সক্রিয় সহযোগিতায়, যুদ্ধের শেষ প্রান্তে এসে, বাঙালি জাতির বিজয়ের শুভলগ্নে, ১৬ ডিসেম্বরের ঘটনাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে একটি কোর্ট ও শার্ট পরিহিত অবস্থায় মহান মুক্তিযুদ্ধের সহ-অধিনায়ক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার মুজিব নগর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।

যাহোক একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বেলা তিনটা নাগাদ ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সস্ত্রীক হেলিকপ্টারে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে হাজির হলেন। পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী তাঁকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্যালুট করার পর করমর্দন করলেন। সে এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য। কিছুক্ষণ পর এই জেনারেল অরোরার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হবে।

এদিকে দুপুর থেকে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা এসে ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করতে শুরু করলো। এদের মধ্যে ২নং সেক্টরের এ টি এম হায়দারের নেতৃত্বাধীন ক্র্যাক-প্লাটুন অন্যতম। ডেমরা থেকে মুগদাপাড়া, কমলাপুর হয়ে এরা এসে দখল করলো ঢাকা বেতার কেন্দ্র। ঢাকায় এক আশ্চর্য দৃশ্যের সৃষ্টি হলো। মাত্র নয় মাস আগে যে বাঙালি যুবকরা সঠিক ভাবে লাঠির ব্যবহার পর্যন্ত জানতো না, তারাই এখন মুখে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মত দাড়ি, পরনে সামরিক পোশাক আর হাতে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঢাকার রাজপথে জয় বাংলা শ্লোগানে মুখরিত করছে। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে তাঁরা নীলাকাশের দিকে অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে বিশ্বের মানচিত্রে সৃষ্টি হলো এই স্বাধীন দেশের, শুধু ধর্মের বন্ধনের ভিত্তিতে প্রায় দেড় হাজার মাইলের দূরবর্তী দুটি ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে একটা রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে, আধ্যাত্মিক জগতের ধর্মকে কখনই রাষ্ট্রীয় চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখা কিংবা ক্ষমতাসীনদের সুবিধার জন্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয় এবং পরিণাম শুভ নয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় এর জ্বলন্ত প্রমাণ। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্তমান যুগে একটা রাষ্ট্র গঠনের জন্য সবচেয়ে জরুরী উপাদানগুলো হচ্ছে একই ভৌগোলিক এলাকা, সমচিন্তা ধারার জনগোষ্ঠী, ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ইত্যাদি।

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ইরান-ইরাক, মিসর-লিবিয়া, পাকিস্তান-আফগানিস্তান, সিরিয়া-জর্দান, সুদান কোথাও ধর্মীয় বন্ধনের নামে পারস্পরিক সংঘাত



ঠেকানো যাচ্ছে না। একই ভাবে একাত্তর খ্রিস্টাব্দে ধর্মের জিকির তুলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই বন্ধ করা যায়নি। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি হলো।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর সকালের দিকে সেখানে ঢাকার পথ ঘাট ছিল প্রায় জনশূন্য, বেলা ৩টা নাগাদ সেখানে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় দশ লাখ লোকের জমায়েত হলো। সবাই পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। মাত্র ৯ মাস ৯ দিন আগে ৭ মার্চ এই রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৬ ডিসেম্বর ঠিক সেই জায়গায় পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। আজ সেখানে আবার জনতার ঢল নেমেছে। চারিদিকে শুধু গগণবিদারী 'জয় বাংলা' শ্লোগান।

১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে ঢাকা নগরীর অবস্থা বর্ণনা করা সত্যি দুরূহ ব্যাপার। ৯ মাস কাল যে বাঙালিরা পাক হানাদার বাহিনীকে মদদ যুগিয়েছিল, তারা এখন প্রাণভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। এদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান, তারা এক বস্ত্রে শুধু আশ্রয়ের জন্য ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে হাজির হতে লাগলো। বাকিদের অনেকেই এই ডামাডোলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এদিকে স্বজনহারা বাঙালি পরিবারগুলোতে তখন বুক ফাটা করুণ ক্রন্দন ও আর্তনাদ। রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তখন ভারতীয় সৈন্যদের প্রাণান্তকর অবস্থা। বিকেল চারটার একটু পরেই ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এসে পৌঁছালেন পাকিস্তান ইন্টার্ন কমান্ডের প্রধান এবং পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক সামরিক অধিকর্তা লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীকে সঙ্গে নিয়ে। এরপর পর্যায়ক্রমে পেছনের গাড়ীগুলো থেকে নামলেন মুজিব নগর সরকারের প্রতিনিধি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার, ১০১ মাউনটেন ডিভিশনের প্রধান মেজর জেনারেল নাগরা, এয়ার মার্শাল দেওয়ান, ভাইস এ্যাডমিরাল কৃষ্ণা, ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অবস্টাক মেজর জেনারেল জ্যাকব, ব্রিগেডিয়ার সন্তা সিঙ, ৯৫ মাউনটেন ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার এইচ. এম ক্লাব, ভারতের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল ঘেরাসহ অনেকে। এছাড়া অন্য গাড়ী থেকে শাস্ত্রী পরিবেষ্টিত অবস্থায় নামলেন জমসেদ, রিয়ার এ্যাডমিরাল শরীফ, ব্রিগেডিয়ার বারেক, এয়ার কমোডোর ইমাম উল হক প্রমুখ।

সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। মেজর জেনারেল গান্ধর্ব নাগরার নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যে পাকিস্তান সৈন্যদের একটা কনটিনজেন্ট নিয়মমাফিক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে গার্ড অব অনার প্রদান করলো। কাছেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী। আর প্রায় দশ লাখ লোকের জনতা চিৎকার করছে টাইগার নিয়াজীকে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা তাঁকে কঠোর পাহারায় রেখেছে। বেলা সোয়া চারটা নাগাদ শিখ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা নিরাপত্তা বেষ্টনির মাঝ দিয়ে লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী ও অন্যদের সঙ্গে করে জোর কদমে এগিয়ে চললেন আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মঞ্চে। চারিদিকে তুমুল হর্ষধ্বনি আর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে নীলাকাশের দিকে অবিরাম নিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ।

১৯৭২ *খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে অবতরণের পর আবেগাপ্লুত বঙ্গবন্ধু, দুই পাশে তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম। – ফাইল ছবি*

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ঠিক ৪টা ৩১ মিনিটের সময় পাকিস্তান সরকার ও সেনা বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। প্রায় দশ লাখ লোকের এক জনতা আর শতাধিক বিদেশি সাংবাদিক এই অনুষ্ঠান অবলোকন করলেন। এরপর দুপক্ষের

*ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর শীতের পড়ন্ত বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়) পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। অনুষ্ঠানে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার (বাম দিক থেকে প্রথম)।*

সেনাপতিরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য লে. জেনারেল নিয়াজী তাঁর কোমরের বেল্ট থেকে সুদৃশ্য রিভলভারটা আর ইউনিফর্মের কাঁধ থেকে লে. জেনারেল ব্যাজ দুটো লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে দিয়ে কপালের সঙ্গে কপাল ঘষলেন। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর বাকি সমস্ত সদস্য অস্ত্র সমর্পণ ও ব্যাজ খোলার আনুষ্ঠানিকতা পালন করলো। ঢাকা নগরীর প্রতিটি বাড়িতে তখন গাঢ় সবুজের উপর বাংলাদেশের ম্যাপ অংকিত রক্ত বলয়ের পতাকা উড়ছে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান নামে দেশ দ্বি খণ্ডিত হয়ে পূর্বাঞ্চল এলাকার নামকরণ হলো বাংলাদেশ। অল্পক্ষণের মধ্যে রেডিও মাইক্রোওয়েভে এই সংবাদ মুজিবনগরে গিয়ে পৌঁছালে সেখানে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। বিশ্বের পশ্চিমা দেশগুলোতে বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো। আর বিভিন্ন দেশের বেতার ও টেলিভিশনে অবিরামভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের কথা উচ্চারিত হলো। লন্ডনে প্রবাসি বাঙালিরা বিজয় মিছিল বের করলো।

সাড়ে সাত কোটি বাঙালি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু যে মহান নেতার ডাকে সমগ্র বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশ মাতৃকাকে হানাদার মুক্ত করেছেন সেই মহান নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় কাঙ্খিত স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করেনি। তাই ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বাধীনতা পূর্ণতা পেলো।



## আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের জবানবন্দি

স্কুল জীবন থেকেই আমি পাকিস্তান অর্জনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছি। উপমহাদেশে প্রাক স্বাধীনতা যুগ (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে) আমি মুসলিম লীগের সদস্য ছিলাম এবং আমার পড়াশোনার ক্ষতি করেও আমি পাকিস্তান কায়েমের লক্ষ্যে সক্রিয় ছিলাম।

স্বাধীনতা (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) লাভের পর পাকিস্তানে মুসলিম লীগ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করায় আমরা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ সংগঠিত করি।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আমি প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হই। পরে আমি জাতীয় পরিষদেও নির্বাচিত হই। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আমি দু'বার মন্ত্রী ছিলাম। আমি গণপ্রজাতন্ত্রী চিনেও একটি পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। গণমানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সংবিধান সম্মত একটি বিরোধী দল গঠনের জন্য আমি ইতোমধ্যেই কয়েক বছর কারাজীবন যাপন করেছি।

সামরিক শাসন জারি হবার পর বর্তমান সরকার আমার প্রতি নিপীড়ন শুরু করে। এরা আমাকে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর আটক করে বিনা বিচারে প্রায় দেড় বছর কারান্তরালে রেখেছিল। আমি যখন এভাবে আটক ছিলাম তখন এরা আমার বিরুদ্ধে অর্ধ ডজনের মতো ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। কিন্তু আমি সম্মানের সঙ্গে প্রতিটি মামলা থেকে বেকসুর খালাস লাভ করি। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে আমি কারাগার থেকে মুক্ত হই।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে নোটিশ জারি করা হয়। অর্থাৎ আমাকে ঢাকার বাইরে যেতে হলে প্রস্তাবিত গন্তব্যস্থল সম্পর্কে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে (পুলিশ বিভাগের) লিখিতভাবে জানাতে হতো এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরও লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে অবহিত করতে হতো। গোয়েন্দা বিভাগের লোক আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতো।

আবার ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান সংবিধান চালু করার সময় যখন আমার নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে প্রায় ছ'মাসের মতো বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের উভয় অংশে আওয়ামী লীগ পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী পার্টির অঙ্গদল হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় প্রার্থী হিসাবে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনীত করা হলে আমরা

তাঁর সমর্থনে নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। ক্ষমতাসীন সরকার আমার বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং আমাকে হয়রানির জন্য বেশ ক'টা মামলা দায়ের করে।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে অন্যতম রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আমি ভারতীয় আগ্রাসনের নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং পার্টি ও সমর্থকদের সরকারের যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনের আহ্বান জানাই। আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পার্টি ও প্রতিটি ইউনিটের নিকট প্রেরিত সার্কুলারে সরকারের যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রস্তুতির প্রতি সম্ভাব্য উপায়ে আবেদন করে।

যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর ভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে আমি অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি যুক্ত বিবৃতি মারফত ভারতীয় আগ্রাসনের নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং জনগণকে দেশের যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন তখন আমন্ত্রিত হয়ে আমি ও অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হই এবং পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার আবেদন জানাই। যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তান এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ব পাকিস্তানকে দেশ রক্ষার দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার বক্তব্য আমরা উপস্থাপন করি।

আমি তাসখন্দ ঘোষণার প্রতি সমর্থন করি। কেননা, আমি এবং আমার জনগণ এ মর্মে বিশ্বাস করি যে, আন্তর্জাতিক সমস্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা সম্ভব। প্রগতির লক্ষ্যে বিশ্ব শান্তির নীতিতে আমরা আস্থাশীল।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে লাহোরে সর্বদলীয় কনভেনশন আয়োজিত হলে আমি বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে ৬-দফা দাবি পেশ করি। আমাদের বক্তব্য ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের (তথা পশ্চিম পাকিস্তানের) সমস্যাবলীর সাংবিধানিক সমাধানের ভিত্তিমূলক হচ্ছে এই ৬ দফা প্রোগ্রাম। এই ৬ দফা প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের শর্তাদি বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আমার পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ এই ৬ দফা দাবি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরাজমান অসমতা দূর করার লক্ষ্যে ৬ দফার প্রতি জনমত গড়ে তোলার জন্য আমরা জনসভার আয়োজন করি।

ঠিক এই সময় সরকারি প্রশাসন এবং প্রেসিডেন্টসহ সরকার দলীয় নেতৃবৃন্দ আমাকে অস্ত্রের ভাষা ও 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদির কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করে এবং এক ডজনের বেশি মামলা দায়ের করে আমাকে হয়রানি শুরু করে। খুলনায় একটা জনসভা করে যখন



আমি যশোর হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন যশোরে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে আমাকে প্রথম গ্রেফতার করে। যশোরে আমাকে যাত্রাপথে বাঁধা দিয়ে একটি কথিত 'ক্ষতিকর' বক্তৃতার অজুহাতে ঢাকা থেকে জারিকৃত ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে এই গ্রেফতার করা হয়।

আমাকে যশোরে মহকুমা হাকিমের কোর্টে হাজির করা হলে অন্তবর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর হয়। ঢাকায় ফিরে এসে আমি ঢাকা সদর মহকুমা হাকিমের কাছে উপস্থিত হলে তিনি জামিন না মঞ্জুর করেন। কিন্তু ঢাকার সেশন জজ আমাকে জামিন দিলে সেদিনই আমি মুক্তি লাভ করি। সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমি বাসায় পৌঁছি। সিলেটে কথিত 'ক্ষতিকর' বক্তৃতার অভিযোগে সিলেট থেকে জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ সে রাতেই ৮টা নাগাদ আমার বাসায় হাজির হয়।

আমাকে গ্রেফতার করে পুলিশ প্রহরাধীনে সে রাতেই সিলেট নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে সিলেটের মহকুমা হাকিম আমার জামিন না মঞ্জুর করে আমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়। পরদিন সিলেটের দায়রা জজ আমাকে জামিনে খালাস প্রদান করেন। আমি মুক্তি লাভ করলে ময়মনসিংহের এক জনসভায় কথিত 'ক্ষতিকর' বক্তৃতার অজুহাতে ময়মনসিংহ থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতে পুলিশ জেলগেটে আবার আমাকে আটক করে। সে রাতেই আমাকে পুলিশ প্রহরাধীনে সিলেট থেকে ময়মনসিংহ নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে ময়মনসিংহের মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির করা হলে একই ভাবে জামিন না মঞ্জুর করে জেলে পাঠানো হয়। পরদিন ময়মনসিংহের সেশন জজ আমাকে জামিন প্রদান করেন এবং আমি ঢাকায় ফিরে আসি। এসব এপ্রিল মাসের কথা।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবত ৮ মে তারিখে আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় ভাষণদান করে রাতে ঢাকায় নিজের বাসায় ফিরে আসি। পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২নং রুল মোতাবেক পুলিশ আমাকে রাত একটা নাগাদ আমার বাসা থেকে গ্রেফতার করে। এর পরেই আমার পার্টির বহু নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী অন্যতম।

দিন কয়েক পরেই পাকিস্তান দেশরক্ষা রুলসের ২৩নং ধারা মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব এ মোমেন, সমাজসেবা সম্পাদক

জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এডভোকেট মোল্লা জালাল উদ্দীন আহমেদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এবং প্রাক্তন এমএনএ এম মনসুর আলী, প্রাক্তন এমএনএ জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট আমিন উদ্দীন আহমদ, পাবনার এডভোকেট আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোস্তফা সারোয়ার, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ উল্লাহ, এডভোকেট শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমন্ডি আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব রাশেদ মোশাররফ, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক জনাব সুলতান আহমদ, আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আব্দুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট হাসনাইন এবং ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের বহু কর্মীসহ ছাত্র ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। আমার দু'জন ভাগিনা, একজন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি এবং আরেকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শহীদুল ইসলামকেও আটক করা হয়।

এছাড়া বর্তমান শাসকচক্র পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককে বেআইনী ঘোষণা করে। এর পিছনে একটা মাত্র কারণ হচ্ছে, সময় সময় ইত্তেফাক আমার পার্টি নীতি সমর্থন করেছে। সরকার এই পত্রিকার প্রেস বাজেয়াপ্ত করেছে ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কিছুসংখ্যক ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে। এদিকে চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট-এর প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকে পাকিস্তান দেশরক্ষা রুলস-এ আটক করে কারাগারে অন্ধকার সেলে রাখা হয়েছে।

এসব গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমার পার্টি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন সাধারণ হরতাল আহ্বান করে। সমগ্র প্রদেশে এই প্রতিবাদ ধর্মঘটের জন্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১১ ব্যক্তি নিহত হয় ও প্রায় ৮০০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং অসংখ্য কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান অফিসার এবং অন্যদের সামনে প্রায় প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত তিনি (জনাব মোনেম খান) গভর্নর রয়েছেন



ততদিন পর্যন্ত 'শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে থাকতে হবে'। এটা অনেকেরই জানা রয়েছে।

আমাকে আটক রাখার পর থেকেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে অস্থায়ী কোর্ট বসিয়ে আমার বিরুদ্ধে অনেক দায়েরকৃত মামলার বিচার হয়েছে। প্রায় ২১ মাস কারাগারে আটক থাকার পর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি রাত ১টার সময় আমাকে জোর করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে এসে নির্জন কক্ষে আটক রাখে এবং আমাকে কারো সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করতে দেয়নি। আমাকে কোনো খবরের কাগজ পড়তে দেয়া হয়নি। বাস্তবক্ষেত্রে দীর্ঘ ৯ মাসকাল বাইরের জগৎ থেকে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলাম। এই সময় আমাকে অমানুষিক যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে এবং সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমার মানসিক যন্ত্রণা সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো।

আমার বর্তমান বিচার শুরু হওয়ার মাত্র একদিন আগে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুন তারিখে সর্বপ্রথম আমার পরিচিত এডভোকেট আব্দুস সালাম খানের সাক্ষাৎ লাভ করি এবং তাঁকে আমার অন্যতম আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করি। আমাকে ও আমার পার্টিকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন ও নিপীড়ন এবং অপমানিত করার উদ্দেশ্যেই মিথ্যাভাবে আমাকে এই তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দমন এবং অধিকার আদায়ে বাঁধা সৃষ্টি করা।

এই কোর্টে হাজির হওয়ার আগে আমি কোনো দিনই লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রাক্তন কর্পোরাল আমিন হোসেন, এল এস সুলতান উদ্দীন আহমদ, কামাল উদ্দীন আহমদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহবুবুল্লাহ এবং এই মামলায় জড়িত নৌ, বিমান ও সামরিক বাহিনীর কোনো কর্মচারীকে দেখিনি। আমি তিনজন সিএসপি অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস এবং খান মোহাম্মদ শামসুর রহমানকে চিনি। মন্ত্রী হিসাবে সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন এঁরা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু আমি কখনই এঁদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করিনি কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রে জড়িত হইনি। আমি করাচিতে কোনো সময়েই লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম হোসেন কিংবা জনাব কামাল উদ্দীনের বাসায় যাইনি। অথবা লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম হোসেন কিংবা জনাব কামাল উদ্দীনের করাচির বাসায় আমার সঙ্গে এঁদের কোনো বৈঠক হয়নি। আমার কিংবা জনাব তাজ উদ্দিনের বাসায় কোনো সময়েই এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। ওইসব লোক কোনো সময়েই আমার বাসায় আসেনি এবং তথাকথিত

ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত কাউকে আমি কোনো টাকা-পয়সা দেইনি। আমি কখনই ডা. সাইদুর রহমান অথবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা প্রদানের কথা বলিনি। এঁরা চট্টগ্রামে আমার হাজার হাজার কর্মীর অন্যতম। আমার দলের তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এসব কর্মকর্তার অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী এবং এমএনএ ও এমপিএ। বর্তমানে জাতীয় সংসদের পাঁচজন এবং প্রাদেশিক পরিষদে দশজন আমার দলীয় সদস্য রয়েছেন। চট্টগ্রামে আমার পার্টির জেলা ও নগর কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের অনেকেই প্রাক্তন এমএনএ ও এমপি এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আমি কোনো সময়েই এঁদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য চাইনি। তাই এটা আশ্চর্যজনক যে, আমি মানিক চৌধুরীর মতো একজন সাধারণ ব্যবসায়ী এবং সাইদুর রহমানের মতো একজন সাধারণ এলএমএফ ডাক্তারের কাছ থেকে সাহায্য চাইবো। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নমিনী জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর বিরোধিতা করার জন্য ডা. সাইদুর রহমানকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি কোনো সময়েই ডা. সাইদুর রহমানের বাসায় যাইনি।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। এই পার্টি সংবিধানসম্মত একটা রাজনৈতিক দল এবং দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই পার্টির সুনির্দিষ্ট ও গঠনমূলক ম্যানিফেস্টো ও প্রোগ্রাম রয়েছে। আমি ৬-দফা প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের উভয় অংশের ন্যায়বিচার দাবি করেছি। আমি দেশের জন্য যা কিছু শুভ মনে করেছি তাই-ই সংবিধানের আওতায় দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করেছি। তবুও ক্ষমতাসীন চক্র এবং স্বার্থান্বেষী মহল পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য আমাকে এবং আমার পার্টিকে দাবিয়ে রেখেছে আর আমাকে নিপীড়নের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি মাননীয় ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে বলতে চাই যে, আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমাকে এই মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংবাদপত্রে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি জারিকৃত বিবৃতিতে দেখা যায়, অভিযুক্ত হিসেবে ১৮ ব্যক্তির তালিকা রয়েছে এবং আমার নাম সেই তালিকায় নাই। উক্ত বিবৃতিতে এ মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত সবাই অপরাধ স্বীকার করেছে আর তদন্তকার্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং শীঘ্রই এই মামলা বিচারের জন্য কোর্টে দাখিল করা হবে।



একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে অভিজ্ঞতার আলোকে আমি মন্তব্য করতে চাই যে, সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত সম্পন্ন এবং সমস্ত নথিপত্রের অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিবৃতি প্রকাশিত হতে পারে না। উপরন্তু এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত বিবৃতি নিশ্চিতভাবে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের পূর্বাহ্নে অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

এর আগে যে সব নিপীড়ন ও অত্যাচারের উল্লেখ করেছি এই মামলা হচ্ছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর একটা চক্রান্ত। স্বার্থান্বেষী মহলের শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বর্তমান শাসকচক্র এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। বিমান, নৌ অথবা সেনাবাহিনীর কোনো অফিসারের যোগসাজশে যে কোনো ধরণের ষড়যন্ত্রে আমি নিজেকে যুক্ত করিনি কিংবা আমি এ ধরণের কোনো কাজ করিনি।

আমি নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করছি এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই যে, এই কথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

## সহায়ক গ্রন্থ:

১। আমি বিজয় দেখেছি : এম. আর আখতার মুকুল।
২। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস : ১৯৪৭-৭১, সম্পাদনা : মোনায়েম সরকার।
৩। মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল : তপন কুমার দে।
৪। সম্মুখ সমরে বাঙালী : মো. রফিকুল ইসলাম পি,এম,সি।
৫। বাঙালীর ইতিহাস: ড: মোহাম্মদ হান্নান।
৬। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু, শেখ মুজিবুর রহমান : সম্পাদনা: ডা: শাহাদত হোসেন।
৭। ১৯৭১ এর রণাঙ্গনে বীর মুক্তিযোদ্ধা : অধ্যক্ষ মো: আলী আকবর।
৮। আমি সুভাষ বলছি ঃ শৈলেশ দে খাঁন ডলার ও তপন কুমার দে।
৯। আমি সিরাজুল আলম খান ঃ শামসুদ্দিন পেয়ারা।
১০। ভারত বিভাগ ও মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম : সাব্বির আহমেদ চৌধুরী।
১১। বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) প্রথম খণ্ড : সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম।
১২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১) তৃতীয় খণ্ড : সম্পাদনায় মাহমুদউল্লা।

## সহায়ক পত্রিকা :

১। দৈনিক জনকণ্ঠ।
২। দৈনিক ইত্তেফাক।
৩। দৈনিক সমকাল।
৪। দৈনিক ভোরের কাগজ।
৫। দৈনিক আমাদের সময়।
৬। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন।

--- ০ ---